প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির রূপরেখা

দীপক মুখোপাধ্যায়



সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ বিধান সরণী : কলিকাতা ৬

PRĀGAITIHĀSIK SAMSKRITIR ROOPAREKHĀ

By Dipak Mukhopadhyay

প্রচ্ছদ : দীপক মুখোপাধ্যায়

উদাহরণ চিত্র : সুশান্ত চক্রবর্তী

প্রকাশক : প্রশান্ত ভট্টাচার্য
সারস্বত লাইব্রেরী
206, বিধান সরণী
কলিকাতা 700 006

মুদ্রক : বিভাস ভট্টাচার্য
সারস্বত প্রেস
206, বিধান সরণী
কলিকাতা 700 006

বিশেষ ছাত্র সংস্করণ : 1960

শিক্ষক

ধরণী সেন-এর

স্মৃতির উদ্দেশে

বিষয় সূচী

চিত্রসূচী

মধ্য প্রস্তর সংস্কৃতি

নব্য প্রস্তর সংস্কৃতি

হাতিয়ার নির্মাণ পদ্ধতি

চারুশিল্প

গৃহ-শিল্প ঃ

গুহা-শিল্প ঃ

1. ভূমিকা

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের সময় থেকে লিখিত ভাষা আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত সময়ের মানব-ইতিহাসকে সাধারণভাবে 'প্রাগিতিহাস' নামে অভিহিত করা হয়। যদিও শব্দার্থের বিচারে 'প্রাগিতিহাস' শব্দটি ভুল—কারণ, ইতিহাসের আগে কোন ঘটনা থাকা সম্ভব নয়; যা কিছু প্রাচীন, যা কিছু অতীত, তা-ই ইতিহাসের অন্তর্গত—তবু, মানব-ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট পর্যায় বোঝাতে এই শব্দটির ব্যবহার সর্বজন স্বীকৃত।

সময়ের বিচারে প্রাগৈতিহাসিক কাল প্রায় পঁচিশ লক্ষ বছর আগে থেকে শুরু করে আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে পর্যন্ত বিস্তৃত। মানব বিবর্তনের ঊষাকাল থেকে ঐতিহাসিক যুগের শুরু পর্যন্ত এই বিপুল সময়ের সংস্কৃতিকে প্রাপ্ত প্রমাণাদির ভিত্তিতে কয়েকটি যুগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়: প্রস্তর যুগ, ধাতু-প্রস্তর যুগ, এবং ধাতু যুগ। এই তিনটি যুগের মধ্যে প্রস্তর যুগ দীর্ঘতম সময় জুড়ে ব্যাপ্ত; আর পরবর্তী দুইটি যুগ অনেক ক্ষেত্রেই আধা-ঐতিহাসিক (Proto-history) বা ঐতিহাসিক কালের অন্তর্ভুক্ত। সেই কারণে, সাধারণভাবে, সমগ্র প্রাগৈতিহাসিক কালকে প্রস্তর যুগ হিসাবেই বিবেচনা করা হয়।

প্রস্তর যুগ: প্রস্তর যুগকে প্রধানত তিনটি উপযুগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়, যথা পুরাতন প্রস্তর যুগ, মধ্য-প্রস্তর যুগ, এবং নব্য-প্রস্তর যুগ। সময়ের হিসাবে পুরাতন-প্রস্তর যুগ দীর্ঘতম এবং সমগ্র প্লিস্টোসিন (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) যুগ ব্যাপী। আর মধ্য ও নব্য প্রস্তর যুগ প্লিস্টোসিনের পরবর্তী সময়ের।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মানুষের আদি সংস্কৃতিকে, বিশেষত প্রস্তর যুগের সংস্কৃতিকে, আজ প্রধানত পাথরের

হাতিয়ারের মাধ্যমেই জানা যায়। তার অর্থ এই নয় যে সে-কালের মানুষ (বা-প্রায়-মানুষ) শুধুমাত্র পাথরের হাতিয়ারই তৈরী ও ব্যবহার করেছে,—বরং শুকনো ডাল-পালা, পশুর হাড়-শিং, প্রভৃতি অধিকতর পরিমাণে ব্যবহৃত হত। কিন্তু সেগুলি মূলত জৈব পদার্থে গঠিত বলে কালক্রমে পচনের মাধ্যমে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। আর, পাথরের হাতিয়ার কালের ঝড়-ঝাপটা সহ্য করে প্রায় অবিকৃতই থেকে গেছে। সেই কারণেই পাথরের হাতিয়ারকে আদি-ইতিহাসের বিশ্বস্ত সাক্ষী হিসাবে গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ, মানুষের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের আদি-পর্বকে জানতে ও বুঝতে হলে মূলত পাথরের হাতিয়ারের উপরই নির্ভর করতে হবে। মানব বিবর্তনের প্রত্যক্ষ জীবাশ্ম প্রমাণের অভাবে তাই হাতিয়ারের উপস্থিতিকেই মানুষের অস্তিত্বের পরোক্ষ প্রমাণ হিসাবে গণ্য করা হয়। আর সেই জন্যই প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বে মানুষকে হাতিয়ার প্রস্তুতকারী প্রাণীরূপে (Man the tool maker) সংজ্ঞাবদ্ধ করা হয়।

প্রাগৈতিহাসিক তথ্য-প্রমাণের মাধ্যমে জানা সম্ভব হয়েছে যে, প্রথম হাতিয়ার তৈরীর আগে বহু হাজার বছর ধরে প্রায়-মানুষ জীবকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তু সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহারের ব্যাপারটা রপ্ত করতে হয়েছিল। এটা সহজেই অনুমেয় যে প্রাথমিক পর্যায়ে পাথরের চাঙর, গাছের ডাল, এবং মৃত জন্তুর হাড় ও শিং-ই হাতিয়াররূপে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রতিনিয়ত ব্যবহারের অভিজ্ঞতা থেকে এ শিক্ষা লাভ করা খুবই স্বাভাবিক যে, একটা সাধারণ পাথরের তুলনায় কোন খণ্ড-পাথর, যা কিছুটা ধারালো বা সূচালো, তা অনেক বেশী কার্যকরী; এবং সেই ধারালো বা সূচালো পাথরের টুকরো দিয়ে যদি কোন সাধারণ গাছের ডালকেও সূচালো করে নেওয়া যায় তবে তাকেও সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা সম্ভব। এই পর্যায়েই প্রায়-মানুষ জীব হাতিয়ার তৈরীর

প্রাথমিক স্তরে পৌঁছেছিল; এবং স্বভাবতই, এই পর্যায়ের হাতিয়ারগুলোকে প্রাকৃতিক বস্তু থেকে পৃথক করে চেনা প্রায় দুঃসাধ্য। যাই হোক, প্রচুর ব্যর্থতা ও আংশিক সাফল্যের মাধ্যমে, বহু সহস্র বছরের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের বিনিময়ে মানুষের পূর্ব-পুরুষ গোষ্ঠী হাতিয়ার প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়েছিল—আর সেখানেই সংস্কৃতির সূত্রপাত। এই হাতিয়ার-ভিত্তিক বা সংস্কৃতি-ভিত্তিক অভিযোজনই তাকে বাঁচার লড়াইয়ে সাফল্য এনে দিয়েছিল।

কালনির্ণয়: প্রাগৈতিহাসিক সময়ের, বিশেষত প্রস্তর যুগের, মানুষের ব্যবহৃত যে সমস্ত হাতিয়ার এবং বস্তু-সংস্কৃতির অন্যান্য নিদর্শন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে, তা থেকে সে সময়ের সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে। সে বিষয়ে আলোচনার আগে প্রাগৈতিহাসিক বস্তুর কালনির্ণয় পদ্ধতিগুলো সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

কালনির্ণয়ের পদ্ধতিগুলোকে প্রধানত দুটি দলে ভাগ করা যায়: আপেক্ষিক (relative), এবং চরম বা প্রত্যক্ষ (absolute) পদ্ধতি। সমস্ত পদ্ধতি সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, ক্ষেত্র বিশেষে এক বা একাধিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। তবে কোন প্রাগৈতিহাসিক বস্তুর সঠিক কাল নির্ণয়ে উভয় পদ্ধতির প্রয়োগ আদর্শ।

আপেক্ষিক পদ্ধতি: একটি পিচের রাস্তা খুঁড়লে, পিচের আস্তরণের তলায় ছোট পাথরের কুচি, তার নীচে বড় পাথরের টুকরো, তার নীচে ইঁটের টুকরো, তারও নীচে মাটি—এইভাবে, যেসব বস্তু দিয়ে রাস্তাটা তৈরী হয়েছে সেগুলোর ক্রমিক বিন্যাস লক্ষ্য করা যাবে। এই বস্তুগুলোর মধ্যে সব থেকে নীচে যা আছে, অর্থাৎ ইঁটের টুকরো, সেটা প্রথম ফেলা হয়েছে, তারপর বড় পাথর, তারপর ছোট পাথরের কুচি। অর্থাৎ ওপর থেকে যত নীচের দিকে যাওয়া যাবে তত প্রাচীনতর স্তর মিলবে। রাস্তার

এই স্তরগুলোর নীচে, মাটির ওপরে যদি কোন জিনিস পাওয়া যায় তবে নিঃসন্দেহে বলা সম্ভব যে ওই রাস্তাটা যতদিন তৈরী হয়েছে, প্রাপ্ত বস্তুটি তার চেয়ে পুরানো। অনুরূপভাবে, বস্তুটি যদি বড় পাথরের তলায় এবং ইঁটের স্তরের ওপরে পাওয়া যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গেই বলা যাবে যে বস্তুটির প্রাচীনত্ব ইঁটের স্তরের চেয়ে কম কিন্তু বড় পাথরের স্তরের চেয়ে বেশী। ভূ পৃষ্ঠে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার ফলে প্রতিনিয়ত মাটির আস্তরণ পড়ছে এবং তার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে বিভিন্ন স্তরের, এবং স্বাভাবিকভাবেই, ওপরের স্তর নীচের স্তরের তুলনায় আধুনিক এবং বর্তমান ভূ-পৃষ্ঠ সর্বাধুনিক।

ভূ-পৃষ্ঠের কোন স্তর থেকে যদি কোন জীবাশ্ম, পাথরের হাতিয়ার বা অন্য কোন প্রাগৈতিহাসিক বস্তু আবিষ্কৃত হয় তবে সেই বস্তুটির প্রাচীনত্ব কিভাবে নির্ধারিত হবে? প্রথমেই দেখতে হবে, যে স্তর থেকে বস্তুটি পাওয়া গেল সেটা মাটির উপরিতল থেকে কতটা নীচে। তারপর বিচার করতে হবে, যে জায়গা থেকে বস্তুটি পাওয়া গেছে সেখানকার মাটির স্তর-বিন্যাস আশপাশের স্তর-বিন্যাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা। অর্থাৎ কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বা কোন মানুষের দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে বস্তুটি সেখানে এসেছে কিনা। যেমন, কেউ যদি ইচ্ছে করে একটি দশ-পয়সা পাঁচ হাত মাটির নীচে পুঁতে রাখে। তবে বলা বাহুল্য, যে-স্তর থেকে পয়সাটি পাওয়া যাবে সেই স্তরের প্রাচীনত্ব তার প্রাপ্য নয়। আবার, ভূমিকম্পের ফলেও সমস্ত স্তর-বিন্যাস ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে। কাজেই, প্রাথমিকভাবে সেটা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এই বিষয়ে আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য আলোচ্য বস্তুটি যে-স্তর থেকে পাওয়া গেছে সেই স্তরের কাছাকাছি অন্যান্য যেসব জৈব পদার্থ পাওয়া যাবে, সেগুলোর সমকালীনতা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। একটি রাসায়নিক পদ্ধতি দ্বারা এই পরীক্ষা করা হয়। এটি ফ্লোরিন-পরীক্ষা-পদ্ধতি নামে পরিচিত।

ফ্লোরিন একটি গ্যাসীয় পদার্থ। প্রকৃতিতে এটি মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না, সাধারণত ফ্লোরাইড যৌগ হিসাবে পাওয়া যায়। এই ফ্লোরাইড যৌগ ভূগর্ভস্থ জলে কিছু-না-কিছু পরিমাণে বর্তমান থাকে। অবশ্য পৃথিবীর সর্বত্র জলে এই ফ্লোরাইডের পরিমাণ সমান নয়। জীব-জন্তুর (এবং মানুষের) হাড় ও দাঁত প্রধানত Hydroxyapatite রূপে ক্যালসিয়াম ফসফেট [$Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$] দ্বারা গঠিত। এবং এই খনিজ পদার্থটি জলে অবস্থিত ফ্লোরিন আয়নকে আবদ্ধ করে ফ্লোরাপাটাইটে [$Ca_{10}(PO_4)_6F_2$] রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ একটি OH^- আয়ন একটি ফ্লোরিন আয়ন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এই ফ্লোরাপাটাইট যৌগটি জলে দ্রাব্য নয়। আবহাওয়া ও পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে এর বাঁচার ক্ষমতা হাইড্রক্সি-অ্যাপাটাইট-এর তুলনায় বেশী। ভূগর্ভস্থ কোন হাড়ের টুকরো বা দাঁতের জীবাশ্মতে যে পরিমাণ ফ্লোরিন সঞ্চিত হয় আবিষ্কারের পরে তার পরিমাপ করা সম্ভব। এবং এই তত্ত্বের ভিত্তিতে কোন নির্দিষ্ট স্থানে, ভূস্তরের একই অবস্থানে প্রাপ্ত দুটি জীবাশ্মের ফ্লোরিনের পরিমাণ তুলনা করে বলা সম্ভব ওই দুটি বস্তু সমকালীন কিনা। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে মানব বিবর্তনের একটি ধাপ হিসাবে একদা প্রতিষ্ঠিত পিল্‌টডাউন জীবাশ্ম (Eoanthropus *dowsoni*) জাল বলে প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে।

প্রাপ্ত কোন নিদর্শন যে স্তর থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে সে-স্তরে অবস্থান করার যৌক্তিকতা বিচারের পর তার প্রাচীনত্ব নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়। সেটা সম্ভব কতকগুলো উপায়ে। প্রথমত, বস্তুটির আশেপাশে (একই স্তরে) যদি অন্য কোন প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া যায় তবে প্রত্ন-প্রাণীবিদের সাহায্যে জানা যেতে পারে সেই ধরনের প্রাণী কত বছর আগে পৃথিবীতে জীবিত ছিল, এবং সেই প্রাণী শীতল অথবা উষ্ণ প্রতিবেশের পরিচায়ক।

তা থেকে মোটের ওপর একটা সময়ের এবং তখনকার আবহাওয়ার আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, সেই স্তর এবং ওপরের ও নীচের স্তর থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন প্রাচীন উদ্ভিদের পরাগরেণু (pollen grain) থেকে প্রত্ন-উদ্ভিদবিদের (Palynologist) সাহায্যে জানা যেতে পারে যে সেই সময়ে এবং তার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ে সেই অঞ্চলে কি ধরনের গাছপালা ছিল। বিভিন্ন গাছের পরিচয় পাওয়ার পর তখনকার আবহাওয়া সম্বন্ধে আরও সঠিকভাবে ধারণা করা যাবে। আবহাওয়ার বিষয়টা এখানে এত গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্লিস্টোসিন যুগে—যেযুগে মানব বিবর্তনের অধিকাংশ এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ সংঘটিত হয়েছিল—পৃথিবী-পৃষ্ঠের আবহাওয়ায় ব্যাপক, দীর্ঘস্থায়ী এবং পর্যায়ক্রমিক শীতল ও উষ্ণ আবহাওয়া বিরাজ করেছিল। সে সম্বন্ধে পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

এই সমস্ত বিশ্লেষণ ছাড়া কোন প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হলে আর যা করা হয় তা হল তুলনা। প্রাপ্ত বস্তুর অনুরূপ কোন বস্তু ইতিপূর্বে কোথাও পাওয়া গেছে কিনা এবং পেয়ে থাকলে তার কাল নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা, তা বিচার করে দেখা হয়। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে আলোচ্য বস্তুটি পূর্বে পাওয়া বস্তুটির সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলনা করা হয়। যদি প্রমাণিত হয় যে দুটি একই জাতীয় বস্তু (বা জীবাশ্ম) তাহলে আগে পাওয়া বস্তুটির জন্য যে সময়-কাল নির্ধারণ করা হয়েছে বর্তমান বস্তুটিকেও সেই কালের বলে সাধারণভাবে গ্রহণ করা হয়। যদি এরকম কোন তুলনার সুযোগ না থাকে, তবে নির্ভর করতে হয় বস্তুটির আশেপাশে পাওয়া অন্যান্য জিনিসের (associated finds) প্রাচীনত্বের ওপর। এই সমস্ত বিচারের মাধ্যমেই কোন প্রত্নবস্তুর আপেক্ষিক কাল নির্ণয় সম্ভব। যদিও এই পদ্ধতিতে নির্ধারিত কাল অনেকক্ষেত্রেই চূড়ান্ত বলে স্বীকৃত হয় না।

চরম বা প্রত্যক্ষ পদ্ধতি: প্রত্যক্ষ কাল নির্ধারণ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে যেটা সবচেয়ে বেশী প্রচলিত তা হল তেজস্ক্রিয় কার্বন (radiocarbon) পদ্ধতি। কার্বনের দুটি সমঘর (isotope) আছে, একটির ভরসংখ্যা বারো (C^{12}), অপরটির চোদ্দ (C^{14}). এই C^{12} হচ্ছে সাধারণ কার্বন, যেটি স্থায়ী মৌল; আর C^{14} তেজস্ক্রিয় মৌল এবং অস্থায়ী—তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণের মাধ্যমে C^{12}-এ রূপান্তরিত হয়। এই তেজস্ক্রিয় কার্বন উৎপন্ন হয় বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে মহাজাগতিক রশ্মি দ্বারা নাইট্রোজেন (N^{14})—এর ওপর সংঘাতের ফলে। প্রতিটি আহৃত N^{14} পরমাণু একটি C^{14} পরমাণু এবং একটি প্রোটনের জন্ম দেয়। এই C^{14} তারপর বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে তেজস্ক্রিয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড ($C^{14}O_2$) উৎপন্ন করে। উদ্ভিদ যখন কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সাহায্যে সালোকসংশ্লেষ করে তখন সাধারণ কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ($C^{12}O_2$) সঙ্গে কিছু পরিমাণে তেজস্ক্রিয় কার্বন-ডাই-অক্সাইডও গ্রহণ করে থাকে। এই হল মোটামুটিভাবে C^{14}-এর উদ্ভব এবং জীবজগতে প্রবেশের পদ্ধতি। বায়ুমণ্ডলে এই $C^{14}O_2$ এবং $C^{12}O_2$ একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে বর্তমান থাকায় উদ্ভিদ যখন এই দুয়ের মিশ্রণ গ্রহণ করে সেখানেও উভয়ের অনুপাত নির্দিষ্ট থাকে; এবং অন্যান্য প্রাণী যখন সেই উদ্ভিদ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে সেখানেও সেই একই অনুপাতে C^{14} এবং C^{12} বর্তমান থাকে। অর্থাৎ, পৃথিবীর সর্বত্র C^{14} এবং C^{12} একটি নির্দিষ্ট অনুপাত রক্ষা করে চলে। কোন উদ্ভিদ বা প্রাণী যখন মারা যায় তখন সেই উদ্ভিদ বা প্রাণী এবং প্রতিবেশের মধ্যে যে কার্বন-চক্র স্থাপিত হয়েছিল সেটা বন্ধ হয়ে যায়। এবং মৃত্যুর পরে তার দেহস্থিত C^{14} তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণের মারফৎ C^{12}-এ রূপান্তরিত হতে থাকে—একটি নির্দিষ্ট হারে। কাজেই, যত সময় যেতে থাকবে তত বেশী

পরিমাণে C^{14}, C^{12}-এ পরিণত হতে থাকবে। ফলে, জীবদ্দশায় C^{14} এবং C^{12}-এর যে অনুপাত থাকে, মৃত্যুর পর থেকে সে অনুপাত পরিবর্তিত হতে থাকবে। কোন প্রাগৈতিহাসিক জীবাশ্মে C^{14} এবং C^{12}-এর অনুপাত নির্ধারণ করতে পারলে, এবং কি হারে C^{14}, C^{12}-এ রূপান্তরিত হয় তা জানা থাকলে, কতদিন আগে উক্ত উদ্ভিদ বা প্রাণীর মৃত্যু হয়েছে তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

যে কোন তেজস্ক্রিয় বস্তুর প্রসঙ্গেই তার জীবনার্ধকাল (half-life period) ব্যাপারটা স্বভাবতঃই এসে পড়ে। আর কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থের জীবনার্ধকাল জানতে পারলে তবেই তার তেজস্ক্রিয় ধর্মের সুযোগ নিয়ে সময়ের হিসাব করা যাবে। অর্থাৎ এই জীবনার্ধকাল তেজস্ক্রিয়তার হার নির্দেশক। পরীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে যে C^{14}-এর জীবনার্ধকাল 5568 ± 30 বছর। গাণিতিক জটিলতার মধ্যে প্রবেশ না করে সহজভাবে বললে দাঁড়ায় যে, পরীক্ষাধীন বস্তুটিতে যে পরিমাণ C^{14} বর্তমান, 5568 বছর পূর্বে তার দ্বিগুণ ছিল এবং 5568 বছর পরে তার অর্ধেক পরিমাণ অবশিষ্ট থাকবে। গাইগার কাউন্টার (Geiger Counter) এর সাহায্যে প্রাপ্ত-বস্তুতে C^{14}-এর পরিমাণ জানা সম্ভব। এবং C^{14}-এর বর্তমান পরিমাণ জানতে পারলে মৃত্যুকালে C^{14}-এর পরিমাণ গাণিতিক হিসাবের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব। এখন দুটো পরিমাণের বিয়োগফল থেকে জানা যেতে পারে যে কতগুলো C^{14}, C^{12}-এ রূপান্তরিত হয়েছে। জীবনার্ধকালের সাহায্যে এই রূপান্তরের সময়কাল অনায়াসেই নির্ধারণ করা সম্ভব।

এই তেজস্ক্রিয় কার্বন পদ্ধতির কয়েকটি ব্যবহারগত অসুবিধা আছে। সকল প্রকার বস্তু এই পদ্ধতির উপযোগী নয় ; সাধারণত কাঠ বা গাছের অংশাদি সবচেয়ে উপযুক্ত বস্তু। এছাড়া, শামুক,

হরিণের শিং (জীবাশ্ম নয়) জলা জায়গায় পচে যাওয়া লতা-গুল্ম, শাক-সব্জির তাল, ইত্যাদিকেও পরীক্ষা করা সম্ভব। হাড়ের টুকরোকেও পরীক্ষা করা যায়, কিন্তু সেজন্য যে পরিমাণ হাড়ের প্রয়োজন হয় তা প্রায় সময়েই পাওয়া সম্ভব নয়। উপরন্তু, সাত-আট হাজার বছর আগেকার কোন সংস্কৃতিতে কৃষ্টি-চিহ্ন হিসাবে যে মৃৎপাত্রের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়, এই পদ্ধতিতে সেগুলো পরীক্ষা করা যায় না। দ্বিতীয় অসুবিধা হল, আবিষ্কারের পূর্বে মাটির স্তরাভ্যন্তরে এবং আবিষ্কারের পরে ও পরীক্ষার পূর্বে অন্য কোন কার্বন উৎসের দ্বারা বস্তুটির সংক্রমণের আশঙ্কা। এই সব কারণে পরীক্ষালব্ধ ফলে কিছু পরিমাণে অনিশ্চয়তা থাকার সম্ভাবনা।

তেজস্ক্রিয় কার্বনের জীবনার্ধকাল 5568 বছর হওয়ায় এই পদ্ধতির সাহায্যে খুব বেশী প্রাচীন বস্তুর কাল নির্ণয় সম্ভব নয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে 50,000 বছরের বেশী প্রাচীন বস্তুতে যে পরিমাণ C^{14} অবশিষ্ট থাকে তা পরিমাপযোগ্য নয়। এই পদ্ধতির এটিও আর এক অসুবিধা। তবে, প্রাগিতিহাসের যে অধ্যায়টি সবচেয়ে ঘটনাবহুল সেই সময়ের পক্ষে এই পদ্ধতি খুবই কার্যকরী। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, আধুনিক মানুষের আবির্ভাবের সময়টা আজ থেকে মাত্র ত্রিশ-বত্রিশ হাজার বছর আগের ঘটনা। ইউরোপের নিম্ন-পেরিগর্ডিয় (অন্ত-পুরাতন প্রস্তর যুগের প্রথম পর্যায়) সংস্কৃতির যে সময় এই পদ্ধতিতে নির্ণীত হয়েছে তা হল খ্রীষ্ট পূর্ব 32,000 থেকে 28,500 বছর। টাটা ইন্‌স্টিটিউট অব ফান্‌ডামেনটাল রিসার্চ এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে ভারতে প্রাপ্ত অনেকগুলো প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনের কাল নির্ধারণ করেছে।

প্রাচীন মৃৎপাত্রের টুকরো (pot-sherd) থেকে কাল নির্ধারণ, প্রত্যক্ষ পদ্ধতির আর একটি উপায়। এই পদ্ধতিকে

তাপপ্রতিপ্রভা (Thermoluminiscence) পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতির মূল ভিত্তি হচ্ছে, সমস্ত প্রকার শিলাতেই কিছু পরিমাণ তেজস্ক্রিয় থোরিয়াম বা ইউরেনিয়াম থাকে, এবং এদের তেজস্ক্রিয়তার ফলে যে আল্‌ফা-কণা বিচ্ছুরিত হয় সেগুলো সমস্ত জৈব ও জড় পদার্থের ক্ষতিসাধন করে। এই তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে খনিজ পদার্থের কেলাস গঠনে (crystal structure) বিকৃতি ঘটে। এখন, এই খনিজ পদার্থকে যদি কয়েক শ' ডিগ্রী তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা যায় তবে সেই বিকৃতি ঘুচে যায় এবং সেইহেতু একপ্রকার উজ্জ্বল আলো নির্গত হয়। এই আলোর পরিমাণ তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত। ফলে, পদার্থটি কতকাল তেজস্ক্রিয় বিকিরণের কাছে উন্মুক্ত ছিল তা হিসাব করে বলা সম্ভব। ফোটো মাল্টিপ্লায়ার (Photo-multiplier) নামক যন্ত্রের সাহায্যে এই আলোর পরিমাপ করা যায়। কাদামাটির ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি প্রযোজ্য। কাদামাটি দিয়ে মৃৎপাত্র তৈরীর পর যখন পোড়ান হয় তখন সেই মাটির প্রাথমিক বিকিরণ-ক্ষতি-চিহ্ন (radiation damage)-গুলো অপসারিত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে সেই মৃৎপাত্র যখন সাংস্কৃতিক বস্তু হিসাবে অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে মাটির নীচে দীর্ঘকাল প্রোথিত থাকে তখন সেটা আবার নতুন করে আহত হয়; এবং সেই মৃৎপাত্রের টুকরোগুলো উত্তপ্ত করে যন্ত্রের সাহায্যে আলোর পরিমাণ মেপে কতকাল বস্তুটি তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সামনে ছিল তা নির্ণয় করা সম্ভব।

উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো ছাড়া আরও একটি প্রত্যক্ষ কাল নির্ণয় পদ্ধতি আজকাল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সেটি তেজস্ক্রিয় পটাসিয়াম (K^{40}) সংক্রান্ত। তেজস্ক্রিয় পটাসিয়াম-40 বিটা কণা বিচ্ছুরণ মারফৎ ক্যালসিয়াম-40 তে এবং কেন্দ্রক কর্তৃক K-শেলের একটি ইলেকট্রন অধিকার মারফৎ আরগণ-40 তে

রূপান্তরিত হয়। [রসায়নের ভাষায় একে K-capture বলে। এই 'K' পটাসিয়ামের প্রতীক নয়; পরমাণুর কেন্দ্রককে বেষ্টন করে যে shell বা কক্ষগুলো আছে এটি তাদের একটি।] প্রতি একশ'টি K^{40} পরমাণুর মধ্যে উননব্বইটি পরিণত হয় Ca^{40} তে এবং এগারটি A^{40} তে। K^{40}-এর জীবনার্ধকাল একশ ত্রিশ কোটি (1300,000,000) বছর। অর্থাৎ একশ ত্রিশ কোটি বছরে অর্ধেক পরিমাণ K^{40}, Ca^{40} এবং A^{40} তে রূপান্তরিত হয়। এটা একটা বিপুল সময়। সেইজন্য এই পদ্ধতির সাহায্যে প্রাগিতিহাসের প্রাচীনতম নিদর্শনেরও কাল নির্ণয় করা সম্ভব,—যা C^{14} পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত শিলাতেই K^{40} বর্তমান, এবং A^{40} ও K^{40} অন্যান্য অনেক মৌলের তুলনায় সহজে পরিমাপযোগ্য। এই পদ্ধতিকে পটাসিয়াম-আরগণ পদ্ধতি বা সংক্ষেপে K-A পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্লিস্টোসিন যুগের শুরু পঁচিশ থেকে ত্রিশ লক্ষ বলে প্রমাণিত হয়েছে; এবং পূর্বের প্রচলিত ধারণা (দশ লক্ষ বছর) ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

তেজস্ক্রিয় রুবিডিয়ামকেও (Rb^{87}) সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কাল নির্ধারণে ব্যবহার করা হয়। এই তেজস্ক্রিয় Rb^{87} বিটা কণা বিচ্ছুরণ মারফৎ স্ট্রনসিয়াম-এ রূপান্তরিত হয়। তবে উৎপন্ন স্ট্রনসিয়ামের পরিমাণ এত সামান্য যে তা পাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য। সেই কারণে এই পদ্ধতি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। এছাড়া তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম এবং থোরিয়াম থেকে উৎপন্ন হিলিয়াম গ্যাসকেও কাল নির্ধারণে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে, প্রাগৈতিহাসিক সময়কালের ক্ষেত্রে সেগুলো সুপ্রযোজ্য নয়।

তেজস্ক্রিয় পদ্ধতিগুলো ছাড়া আরও দুটি পদ্ধতি দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে কাল নির্ধারণ করা হয়। সেগুলো হল ভার্ভ (verve) গণনা এবং বৃক্ষবলয় (tree ring) গণনা।

হিমবাহের আওতার মধ্যে যে সমস্ত হ্রদ দেখতে পাওয়া যায় সেই হ্রদের তলার পাললিক স্তরকেই ভার্ভ বলে। হিমবাহ-গলা জল যে-সব পদার্থ বয়ে নিয়ে আসে এই স্তরগুলো মূলত তা দিয়েই তৈরী। গ্রীষ্মকালে হিমবাহ যে পরিমাণে গলবে এবং সেই জল যে পরিমাণ জিনিস (নুড়ি প্রভৃতি) হ্রদের তলায় জমা করতে পারবে, শীতকালে তার তুলনায় কম গলার ফলে অতি সামান্য বস্তুই জমা করতে পারবে। অর্থাৎ শীতকালের স্তরগুলো এত পাতলা হবে যে সেগুলোকে নগণ্য বিবেচনা করে এক একটি পুরু স্তরকে এক-এক বছর বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। আজ পার্বত্য অঞ্চলে যে সব হ্রদে সারা বছর জল দেখা যাচ্ছে, প্লিস্টোসিন যুগে হিমবাহকালে সেগুলো নিশ্চয়ই বরফ ঢাকা অবস্থায় থাকত। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে পরবর্তী আন্তহিমবাহ সময়ে যখন হিমরেখা উত্তর দিকে উঠে যেতে শুরু করেছিল তখন থেকেই সেই সব হ্রদে নতুনভাবে স্তর গঠন শুরু হয়েছিল। সেই অনুসারে, শেষ হিমবাহ আজ থেকে কত বছর আগে তার উত্তরায়ণ শুরু করেছিল তা নির্ণয় করার জন্য স্ক্যান্‌ডিনেভিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে গবেষণা চালানো হয়। উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত বলে হিমবাহ সংক্রান্ত ঘটনাবলীর সঙ্গে এদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। দক্ষিণ ও উত্তর দিকের হ্রদের স্তরসমূহ গণনা করে জানা গেছে যে আজ থেকে প্রায় তেরো হাজার বছর আগে স্ক্যান্‌ডিনেভিয়ার দক্ষিণ থেকে হিমবাহ উত্তর দিকে সরে যেতে শুরু করেছিল। অর্থাৎ, বলা যেতে পারে যে স্ক্যান্‌ডিনেভিয়ায় প্লিস্টোসিন যুগের পরিসমাপ্তি প্রায় তেরো হাজার বছর আগে শুরু হয়েছিল। ভার্ভ-স্তর গণনা করে যে সময় নির্ধারিত হয় তা প্রায় নির্ভুল। তবে, এই পদ্ধতির প্রয়োগ বিশেষ অঞ্চলেই সীমিত।

বৃক্ষবলয়-পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক নাম ডেনড্রোক্রোনোলজি (Dendrochronology)। এই পদ্ধতির ভিত্তিভূমি হল, কোন

গাছের কাণ্ডকে আড়াআড়িভাবে কাটলে যে বৃত্তাকার দাগগুলো দেখা যায় সেগুলোর গণনা। সেটা কিভাবে করা হয় তা জানার আগে কিভাবে বৃত্তগুলোর উৎপত্তি হয় তা জানা প্রয়োজন। সাধারণত গ্রীষ্ম-বর্ষায় গাছের বৃদ্ধি শীত-বসন্তের তুলনায় বেশী। বেশী বৃদ্ধির সময় কোষগুলো পাতলা কোষপ্রাচীর সম্পন্ন থাকে এবং কম বৃদ্ধির সময়ের কোষগুলো আকারে ছোট হয় ও কোষ প্রাচীর মোটা হয়ে যায়। ফলে, দুটো বেশী বৃদ্ধির (অর্থাৎ দুটো বছর) বৃত্তের মধ্যে একটি বিভেদকারী বৃত্ত গঠিত হয়। তাই, বাৎসরিক বৃত্তগুলোকে চিনতে কোন অসুবিধা হয় না। একটি গাছের কাণ্ড থেকে যে সামান্য কয়েক বছরের হিসাব পাওয়া যায় তা দ্বারা প্রাগৈতিহাসিক কাল নির্ধারণ কিভাবে সম্ভব? বৃদ্ধির বলয়গুলোকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে প্রত্যেকটি বৃদ্ধি-বলয় (growth ring) সমান নয়। কারণ প্রত্যেক বছর একই হারে গাছের বৃদ্ধি ঘটেনি। এই বৃদ্ধি নির্ভর করে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণের ওপর। এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও গাছের বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত। এই যুক্তি দ্বারা বিভিন্ন বলয়কে চিহ্নিত করা সম্ভব এবং এটাই এই পদ্ধতির চাবিকাঠি। এবারে, একটি অধুনাকাটা গাছের বলয়গুলো পর্যবেক্ষণ ও গণনা করা হল; তারপর তার চেয়ে পুরানো একটি গাছের বলয়গুলোর তুলনামূলক বিচার করে পূর্বোক্ত গাছের প্রাচীনতর বলয়গুলোর সঙ্গে শেষোক্ত গাছের নবীনতর বলয়গুলোর সম্পর্ক আবিষ্কার করা হয় এবং সেখান থেকে বৃত্তসংখ্যা গণনা করা হয়। এইভাবে, ক্রমাগত প্রাচীন গাছের সাহায্যে সময়ের দিকে পিছিয়ে যাওয়া সম্ভব। এই পদ্ধতির সাহায্যে আরিজোনাতে পুয়েব্লো-দের (Pueblo) একটি প্রাচীন আবাসস্থল 1900 বছরের পুরানো বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে সুনির্দিষ্টভাবে বৎসর গণনা সম্ভব হলেও এর প্রয়োগ অত্যন্ত সীমিত। কারণ, এর জন্য

যে পরিমাণ গাছ বা গাছের জীবাশ্ম প্রয়োজন হয় তা প্রায় কখনই পাওয়া সম্ভব নয়। তবে এই পদ্ধতির সাহায্যে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (তুলনামূলক) এবং এগারো বছর পর পর যে সৌর কলঙ্কের আবির্ভাব হয় সে সম্বন্ধে নানা তথ্য জানা সম্ভব।

প্রাগৈতিহাসিক বস্তু বা সাধারণভাবে প্রত্নবস্তুর প্রাচীনত্ব নির্ধারণের জন্য সচরাচর যে সব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, ওপরে সেগুলো সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হল। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকটি পদ্ধতিই অত্যন্ত জটিল এবং অন্যান্য অনেক কিছুর ওপর নির্ভরশীল ; এবং স্থান-কালের সুবিশাল ব্যাপ্তির তুলনায় প্রত্নবস্তুর সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রত্যক্ষ বা চরম পদ্ধতিগুলোর সাহায্যে কাল নির্ণয় অনেক সঠিকভাবে করা সম্ভব হলেও আপেক্ষিক পদ্ধতিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আপেক্ষিক পদ্ধতিগুলোর সাহায্যে প্রাগৈতিহাসিক কোন সময়ের আবহাওয়া, প্রাণীজগৎ, গাছ-গাছালি এবং মানব সংস্কৃতির অবস্থা সম্বন্ধে একটা সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি, আপেক্ষিক পদ্ধতির পরিপূরক মাত্র।

2. ভূ-তাত্ত্বিক কালক্রম ও প্লিস্টোসিন যুগ

প্রায় সাড়ে চারশ থেকে পাঁচশ কোটি বছর আগে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল বলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মহল মনে করে। সৃষ্টি-কালে পৃথিবীতে প্রাণের কোন চিহ্ন ছিল না। আদিতম প্রাণের অস্তিত্বের পরোক্ষ প্রমাণ মেলে প্রায় তিনশ কোটি বছর আগের শিলাস্তর থেকে। আর সুনিশ্চিত জীবাশ্ম প্রমাণ প্রায় একশ কোটি বছরের প্রাচীন।

প্রাচীনতম প্রাণের কথা বাদ দিলে, আমাদের পরিচিত প্রাণী ও উদ্ভিদের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত পৃথিবীর জীবনকে প্রাথমিক ভাবে তিনটি পর্বে বিভক্ত করা হয়: পুরাজীবীয় (Palaeozoic); মধ্যজীবীয় (Mesozoic), এবং নবজীবীয় (Cenozoic)। প্রত্যেকটি পর্বকে আবার একাধিক যুগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়। নীচে 2. 1 নং সারণির মাধ্যমে বিভিন্ন পর্ব, যুগ, প্রাচীনত্ব, প্রাণের প্রকার, বিবর্তন প্রকার, প্রভৃতি দেখানো হল।

মানব বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর ইতিহাসের মধ্যজীবীয় কাল পর্যন্ত সময়ের বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই। কারণ, ওই সময় পর্যন্ত মানুষ বা তার পূর্বপুরুষদের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় নি। নবজীবীয় পর্বের শুরু থেকেই মানুষের আত্মীয়বর্গের (প্রাইমেট) আবির্ভাবের প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাই, সেই সময় থেকেই মানব বিজ্ঞানের আলোচনা শুরু করা হয়। নবজীবীয় পর্বকে আবার দুটি বিভাগের মাধ্যমে আলোচনা করা হয়—প্রথম অংশকে "তৃতীয় বিভাগ" বা Tertiary Division, এবং পরবর্তী অংশকে "চতুর্থ বিভাগ" বা Quaternary Division নামে অভিহিত করা হয়।

বছর আগে	পর্ব	বিভাগ	যুগ	প্রথম আবির্ভাব	বিবর্তন প্রকার
25 লক্ষ	নবজীবীয়	কোয়াটার-নারি	হোলোসিন প্লিস্টোসিন	মানুষ	জৈব-সাংস্কৃতিক
7 কোটি 50 লক্ষ		টারসিয়ারি	প্লায়োসিন মায়োসিন অলিগোসিন ইওসিন প্যালিওসিন	প্রাইমেট স্তন্যপায়ী প্রাণী সপুষ্প উদ্ভিদ	জৈবিক
20 কোটি 50 লক্ষ	মধ্যজীবীয়		ক্রেটাসিয়াস জুরাসিক ট্রায়াজিক	জিম্‌নো-স্পার্ম্‌ সরীসৃপ	
50 কোটি	পুরাজীবীয়		পারমিয়ান পেনসিলভেনিয়ান মিসিসিপিয়ান ডেভোনিয়ান সিসুরিয়ান আরগেভিসিয়ান ক্যাম্‌ব্রিয়ান	উভচর ও পতঙ্গ উদ্ভিদ ও মাছ এ্যাল্‌গি অমেরুদণ্ডী প্রাণী	

100 কোটি বছর আগে : সুনিশ্চিত জীবাশ্ম প্রমাণ।

310 কোটি বছর আগে : প্রাণের অস্তিত্বের পরোক্ষ প্রমাণ।

450-500 কোটি বছর আগে : পৃথিবীর সৃষ্টি।

সারণি 2.1

টারসিয়ারি বিভাগটি প্রায় সাত কোটি পঁচিশ লক্ষ বছর ব্যাপ্ত। এই বিভাগের শুরু থেকেই প্রাইমেট বর্গের বিভিন্ন সদস্যের আবির্ভাব ঘটে। প্যালিওসিন যুগে টুপাইয়া, টারসিয়ার, লেমুর, এবং লোরিস-এর উদ্ভব ঘটে; অলিগোসিন যুগে বিভিন্ন ধরনের বানরের আবির্ভাব, এবং এপ ও মানুষের সাধারণ পূর্বপুরুষের সাক্ষাৎ মেলে। পরবর্তী যুগ মায়োসিনে এপ ও মানুষের শাখার

পৃথকীভবন ঘটে। প্লায়োসিনের শুরুতে মানব পরিবার (Hominidae)-এর প্রথম সদস্যের পরিচয় পাওয়া যায় রাম-পিথেকাস (Ramapithecus *punjabicus*) জীবাশ্মের মাধ্যমে। সুতরাং, মানব বিবর্তন তথা সমগ্র প্রাইমেট বর্গের বিবর্তনের ঘটনাসমূহ এই বিভাগেরই বিভিন্ন স্তর থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া এই টারসিয়ারি বিভাগেই পৃথিবীব্যাপী পর্বতোত্থান এবং আনুষঙ্গিক ঘটনাবলীর মাধ্যমে পৃথিবী-পৃষ্ঠ আজকের রূপ ধারণ করে। এই সময়েই হিমালয় এবং আল্‌প্‌স্ পর্বতমালা উত্থিত হয়। ভূ-পৃষ্ঠের এই নতুন বিন্যাসের ফলে ভূ-প্রকৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে, যা পরিশেষে সমগ্র জীবজগতের বিবর্তন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

কোয়াটারনারি বা "চতুর্থ বিভাগ" মানব বিজ্ঞানীর কাছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এই বিভাগে দুটি যুগকে আলাদাভাবে বিবেচনা করা হয়: প্লিস্টোসিন এবং হোলোসিন। প্লিস্টোসিন যুগের শুরু ধরা হয় প্রায় পঁচিশ লক্ষ বছর আগে। এই যুগের বিভিন্ন পর্যায় থেকেই মানব বিবর্তনের অধিকাংশ জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে; এবং এই যুগেরই শেষ ভাগে প্রাচীন মানব আধুনিক মানুষে পরিণত হয়েছে। ফলে, মানব বিবর্তনের অতীত ইতিহাসকে জানতে ও বুঝতে হলে এই প্লিস্টোসিন যুগ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা প্রাথমিক প্রয়োজন। এক বিশেষ আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্যে প্লিস্টোসিন যুগ অন্যান্য যুগ থেকে স্বতন্ত্র। প্লিস্টোসিন যুগের অবসানে, আজ থেকে প্রায় দশ/পনেরো হাজার বছর আগে থেকে যে যুগ শুরু হয়েছে এবং আজও চলছে, ভূ-তাত্ত্বিক পরিভাষায় তাকে হোলোসিন নামে অভিহিত করা হয়েছে।

প্লিস্টোসিন যুগ: আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য

প্লিস্টোসিন যুগ ব্যাপী পৃথিবীতে আবহাওয়ার এক ব্যাপক অস্বাভাবিকত্ব পরিলক্ষিত হয়। এর বৈশিষ্ট্য ছিল, পর্যায়ক্রমে এবং

দীর্ঘস্থায়ী শীতল ও উষ্ণ আবহাওয়ার প্রাদুর্ভাব। পৃথিবী পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য আবহাওয়ার এই বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

শীতল পর্যায়ে, পৃথিবী পৃষ্ঠের গড় বার্ষিক তাপমাত্রা হ্রাসের ফলে হিমমণ্ডলে, এবং নাতিশীতোষ্ণ ও উষ্ণমণ্ডলের উঁচু পর্বত চূড়ায় অনেক বেশী পরিমাণে বরফ জমা হয়েছিল,—এত বেশী যে তা বরফের নদীতে পরিণত হয়ে হিমবাহের আকারে সমতল ভূমি পর্যন্ত নেমে এসেছিল। এর ফলে, নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বরফে ঢাকা পড়েছিল। সেইজন্য, শীতল পর্যায়কে "হিমবাহ কাল"-ও বলা হয়ে থাকে। এই পর্যায়ে উষ্ণমণ্ডলে আর্দ্রতা বৃদ্ধি হেতু অত্যধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়েছিল বলে জানা যায়।

উষ্ণ পর্যায়ে গড় বার্ষিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে হিমমণ্ডল ও নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের জমা বরফ জলে পরিণত হয়ে নদী-নালা, সমুদ্র প্রভৃতির আয়তন বৃদ্ধি করেছিল। এবং উষ্ণমণ্ডলে সে সময়ে অত্যধিক গরমের শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করেছিল। এক একটি উষ্ণ পর্যায় দুটি শীতল পর্যায়ের মধ্যবর্তী ছিল বলে একে "আন্ত-হিমবাহ কাল"-ও বলা হয়।

আল্‌প্‌স্‌ পর্বত অঞ্চলে সমীক্ষার মাধ্যমে ডঃ আলব্রেখট পেঙ্ক এবং ডঃ ব্রুক্‌নার দেখিয়েছেন যে সে অঞ্চলে মোট চারটি শীতল পর্যায় এবং অন্তর্বর্তী তিনটি উষ্ণ পর্যায় বর্তমান ছিল। আল্‌প্‌স্‌ পর্বত থেকে উৎসারিত চারটি ছোট নদীর নামানুসারে তাঁরা সেই চারটি হিমবাহ কাল-কে গুন্‌জ্‌ (Gunz), মিন্‌ডেল (Mindel), রিস্‌ (Riss) এবং উর্‌ম্‌ (Wurm) নামে অভিহিত করেন। সেই অনুসারে, তিনটি উষ্ণ আন্তহিমবাহ কাল-কে যথাক্রমে গুন্‌জ্‌-মিন্‌ডেল, মিন্‌ডেল-রিস্‌, এবং রিস্‌-উর্‌ম্‌ নাম দেওয়া হয়। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে সমীক্ষা চালিয়েও শীতল ও উষ্ণ পর্যায়ের সংখ্যা ও পর্যায়ক্রম মোটামুটি সমর্থিত হয়েছে। তবে, কোন একটি

পর্যায় পৃথিবীর সর্বত্র একই সময়ে শুরু বা শেষ হয়নি। আবার, শীতল ও উষ্ণ পর্যায়গুলি অনেকক্ষেত্রেই নিরবচ্ছিন্ন ছিল না। বিশেষত, শেষ শীতল পর্যায়ে স্পষ্টত তিনটি উপ-পর্যায় বর্তমান ছিল এবং সেই উপ-পর্যায়গুলি স্বল্পমেয়াদী উষ্ণ পর্যায় দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল।

এখানে উল্লেখ্য, প্রতিটি আবহাওয়ার কাল (শীতল বা উষ্ণ) অত্যন্ত দীর্ঘ সময় ব্যাপী স্থায়ী ছিল, এবং সেগুলোর শুরু বা শেষ কোনটাই আকস্মিক ছিল না—অতি ধীরে শুরু হয়ে ক্রমে ক্রমে চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছে আবার অতি ধীরে সেই পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। সময়ের হিসাবে বলা যায় যে এক একটি পর্যায় গড়ে প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বছর স্থায়ী ছিল। একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রতিটি পর্যায়ের এই বিপুল সময় জুড়ে আবহাওয়ার বিশেষ বৈশিষ্ট্য (শীতল বা উষ্ণ) সাধারণভাবে বর্তমান থাকলেও তার মধ্যে বার্ষিক ঋতুভেদ ছিল।

প্লিস্টোসিন যুগ ব্যাপী আবহাওয়ার এই বৈশিষ্ট্যকে সাধারণ ভাবে মহাতুষার যুগ (Great Ice Age) নামে চিহ্নিত করা হয়; যদিও তুষার যুগ ছিল একাধিক এবং অন্তর্বর্তী সময়ে উষ্ণ আবহাওয়া বর্তমান ছিল। তাই সূক্ষ্ম বিচারে "মহাতুষার যুগ" নামটি ভ্রান্তিমূলক।

আবহাওয়ার এই ব্যাপক, দীর্ঘস্থায়ী ও পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্নরূপে তার স্বাক্ষর পৃথিবীর বুকে রেখে গেছে। উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষরগুলো নীচে বর্ণিত হল:

(ক) হিমবাহ উপত্যকা—শীতল আবহাওয়ার সময় হিম-মণ্ডলে, এবং নাতিশীতোষ্ণ ও উষ্ণমণ্ডলের পর্বত চূড়ায় যে অত্যধিক বরফ জমা হয়েছিল, অভিকর্ষের বলে সেই বরফ হিমবাহের আকারে অনেকক্ষেত্রে সমতল ভূমি পর্যন্ত নেমে এসেছিল। বর্তমানে সেসব স্থান উন্মুক্ত তৃণভূমিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সেই সব স্থানের (উপত্যকার) আকৃতি থেকে এবং পর্বতের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের

মাধ্যমে বোঝা যায় যে অতীতে সেখান দিয়ে বিশালাকার হিমবাহ প্রবাহিত হয়েছিল। এইসব উপত্যকাগুলো অবতল (U) আকৃতি বিশিষ্ট। বর্তমানকালেও বিভিন্ন পর্বতের উপত্যকা দিয়ে হিমবাহ প্রবাহিত হয়। সেইসব হিমবাহ পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে হিমবাহ যখন নামে, তখন তা অত্যন্ত ধীর গতিতে অগ্রসর হয়—এত ধীরে যে হিমবাহের ওপর বসে থাকলেও তার চলন বোঝা যায় না। সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী হিমবাহ চব্বিশ ঘণ্টায় মাত্র এক ফুট অগ্রসর হয়। অবতরণের সময় সেই বিশাল বরফের নদী এপাশে ওপাশে আন্দোলিত হতে হতে নামে (oscillating movement)—সোজা নামে না। ফলে, হিমবাহের তলায় পর্বতগাত্র মসৃণ ও অবতল হয়। সেই কারণে এই জাতীয় উপত্যকাকে U-আকৃতির উপত্যকা বলে। কাশ্মীর অঞ্চলে গুলমার্গ, পাহালগাঁও, প্রভৃতি স্থান প্রকৃতপক্ষে প্লিস্টোসিন যুগের হিমবাহ উপত্যকা।

(খ) গ্রাবরেখা-জনিত স্তূপ (Morainic deposition বা Boulder Conglomerate)—হিমবাহ যখন অগ্রসর হয় তখন তার পথে পাথর, কাদা-মাটি, গাছপালা, প্রভৃতি যা-কিছু পায় সব নিয়েই সে অবতরণ করে। হিমরেখা অতিক্রম করার পর হিমবাহ যখন ধীরে ধীরে জলে পরিণত হতে থাকে তখন তার আর সেই সব বস্তু বহনের ক্ষমতা থাকে না। তাই, সেগুলো এক এক স্থানে স্তূপাকারে পড়ে থাকে। এইসব স্তূপকেই গ্রাবরেখা-জনিত স্তূপ বা প্রস্তরখণ্ডের স্তূপ বলে। এইসব স্তূপে স্বভাবতই পাঁচ মিশেলি জিনিস থাকে এবং সেখানে কোন স্তরবিন্যাস থাকে না। আরও একটা কথা, হিমবাহের সঙ্গে নামার সময় ঘর্ষণের ফলে পাথরের টুকরোগুলো মসৃণ ও কোণাচে হয়—নদীবাহিত নুড়ির মত গোলাকার হয় না। এবং অনেক সময়েই বরফের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে পাথরের গায়ে লম্বা লম্বা দাগের উদ্ভব হয়।

এইসব গ্রাবরেখা-স্তূপ পরীক্ষা করে বিশেষ বিশেষ হিমবাহ উপত্যকা, তথা বিশেষ বিশেষ হিমবাহের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব। উল্লেখ্য, প্লিস্টোসিন যুগের হিমবাহ থেকে যেসব নদীর উৎপত্তি সেইসব নদী, বিশেষত আন্ত-হিমবাহ কালে, এই প্রস্তর-স্তূপের অংশবিশেষ ভাসিয়ে নিয়ে অন্যত্র জমা করেছিল। ফলে, নদীউপত্যকাস্থিত স্তরসমূহ, প্রস্তরস্তূপ, হিমবাহ উপত্যকা এবং হিমবাহ প্রভৃতি সমস্ত কিছুই পরস্পরের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত।

হিমবাহের চলনের সময় গ্রাবরেখার অবস্থিতি অনুসারে গ্রাবরেখা-স্তূপকে পার্শ্ব (Lateral), মধ্য (Medial), প্রান্তবর্তী (Terminal) এবং তলস্থিত (Ground), প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। বিশেষ বিশেষ অবস্থিতির গ্রাবরেখায় বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে, এবং সেইসব বৈশিষ্ট্যের সাহায্যেই এদের চেনা যায়।

(গ) নদী উপত্যকাস্থিত ধাপ (River terrace)—নদীর স্বাভাবিক কাজ হল যুগপৎ সঞ্চয়ন ও খনন। এই দুটি কাজই নদীতে জলের পরিমাণ ও স্রোতের তীব্রতার উপর নির্ভরশীল। প্লিস্টোসিন যুগে পর্যায়ক্রমিক শীতল ও উষ্ণ আবহাওয়ার ফলে বিভিন্ন নদীও পর্যায়ক্রমিকভাবে শীর্ণ ও স্ফীত হয়েছিল ; এবং সঞ্চয়ন ও খননেও তা প্রতিফলিত হয়েছিল। শীর্ণ অবস্থায় নদী তার বাহিত জিনিস কোন স্থানে যতটা জমা করবে, স্ফীত অবস্থায় তার অনেকটাই কেটে ধুয়ে নিয়ে যাবে এবং নতুন জিনিস জমা করবে।

হিমবাহ কালে নদী, সমুদ্র, প্রভৃতি থেকে প্রচুর পরিমাণ জল বরফরূপে আবদ্ধ থাকায় নদীর কলেবর স্বাভাবিকভাবেই শীর্ণ হয়েছিল। আবার, আন্ত-হিমবাহ কালে সঞ্চিত বরফ গলে প্রচুর পরিমাণ জল নদীর কলেবর বৃদ্ধি করেছিল। এইসব ঘটনার মিলিত ক্রিয়ায় নদী উপত্যকায় বিভিন্ন ধাপের উদ্ভব হয়। এই

ধাপগুলো অবশ্য সিঁড়ির মত একই জায়গায় অবস্থিত নয়—বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত। কারণ নদী চিরকাল একই খাতে প্রবাহিত হয় না—বিভিন্ন কারণে, প্রধানত অধিক সঞ্চয়নের জন্য তার প্রবাহ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। তবে, একই নদীর বিভিন্ন ধাপকে চিত্রে সন্নিবিষ্ট করে ধাপসমূহের পারম্পর্য বিচার করা যায়। নদী যখন প্রথম প্রবাহিত হতে শুরু করে তখন গ্রাবরেখা স্তূপই অধিকাংশ নদীর উচ্চতম ও প্রাচীনতম ধাপ। পরবর্তী ধাপ অবশ্যই তার থেকে নীচে অবস্থিত। এইভাবে ক্রমশ নীচু হতে হতে বর্তমান প্রবাহ-তল নিম্নতম। এটা সহজেই বোঝা যায় যে নদী উপত্যকাস্থিত ধাপসমূহ ভূ-স্তর বিন্যাসের (geologcial strata) বিপরীতক্রমে সজ্জিত। ভূ-স্তরের উদ্ভব ক্রম-সঞ্চয়নের ফলে, আর নদী-স্তরের উদ্ভব ক্রম-ক্ষয়ের ফলে। তবে, নদী-স্তরের কোন একটি নির্দিষ্ট ধাপের বস্তুসকল সঞ্চয়নের ফলে উদ্ভূত বলে সেক্ষেত্রে ভূ-স্তরের নিয়ম কার্যকরী। অর্থাৎ কোন একটি ধাপের বস্তুসামগ্রীর মধ্যে নীচের অংশের তুলনায় উপরের অংশ নবীনতর।

নদী উপত্যকাস্থিত ধাপসমূহকে বিশেষ বিশেষ হিমবাহ ও আন্ত-হিমবাহ কালের সঙ্গে সম্পর্কিত করাটা কোন ধাপের প্রাচীনত্ব নির্ণয়ে খুবই প্রয়োজনীয়। কারণ একমাত্র সেই পদ্ধতিতেই নদীর ধাপের অন্তর্গত বস্তু-সামগ্রীর, যার মধ্যে প্রাচীন মানবের সংস্কৃতি-বস্তুও থাকতে পারে, কাল নির্ণয় সম্ভব।

(ঘ) লোয়েস (Loess)—এটা এক ধরনের বায়ু-পরিবাহিত মাটি। বিভিন্ন হিমবাহ কালে বায়ু চলাচলের দিক পরিবর্তিত হয়েছিল এবং হিমবাহ কবলিত অঞ্চলগুলি সাধারণত শুষ্ক ছিল। ফলে, হিমবাহ কালে একস্থান থেকে অন্য স্থানে এই ধরণের মাটি বায়ু পরিবাহিত হয়ে জমা হয়েছিল। ফ্রান্স, চীন, এবং ভারতের পাঞ্জাবে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই লোয়েস-এর সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। লোয়েস-জনিত মাটি অত্যন্ত উর্বর এবং সঞ্চিত লোয়েস-

স্তরের একটি পাশ সাধারণত খাড়া (vertical) থাকে। লোয়েসকে হিমবাহ কালীন আবহাওয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবে গণ্য করা হয় ; এবং লোয়েসের অন্তর্গত কোন বস্তুর কাল নির্ণয়ের জন্য কোন নির্দিষ্ট লোয়েস-স্তরের গঠনের সময় জানা অবশ্য প্রয়োজন।

উপরোল্লিখিত স্বাক্ষরগুলো ছাড়া তুষার যুগের আবহাওয়ার ফলস্বরূপ পৃথিবী পৃষ্ঠে আরও অনেক প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয়েছিল, যেমন, ঘন ঘন ভূ-কম্পন, পর্যায়ক্রমে শীতল ও উষ্ণ আবহাওয়ার ফলে মাটির বিদারণ ও সঞ্চালন (soil creep) এবং সমুদ্র-পৃষ্ঠের (sea surface) পর্যায়ক্রমিক উত্থান-পতন, প্রভৃতি। হিমবাহ কালে প্রচুর পরিমাণে সমুদ্র জল বরফে পরিণত হওয়ায় সমুদ্র-পৃষ্ঠ অপেক্ষাকৃত নীচু হয়েছিল এবং তার ফলে মহাদেশগুলির মধ্যে স্থল-সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। আবার, পরবর্তী উষ্ণ পর্যায়ে বরফগলা জলে যখন সমুদ্র-পৃষ্ঠ উন্নত হয়েছিল, তখন সেই স্থল-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। ফলে, শীতল পর্যায়ে প্রাণী ও মানুষের আন্তর্মহাদেশীয় পরিযান (migration) ঘটেছিল। বিবর্তন ইতিহাস অনুধাবনে এই পরিযানের তাৎপর্য উল্লেখযোগ্য।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে প্লিষ্টোসিন যুগে আবহাওয়ার এই ব্যাপক, দীর্ঘস্থায়ী এবং পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন সে-যুগের প্রাণীর অভিযোজন তথা বিবর্তনে এক উল্লেখযোগ্য পটভূমির সৃষ্টি করেছিল। সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য ও গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রাণী, উদ্ভিদ ও আবহাওয়ার এই অভূতপূর্ব পটভূমিতে মানব বিবর্তনের অধিকাংশ তথা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও ঘটনাবহুল অংশ সম্পন্ন হয়। সুতরাং মানব বিবর্তনকে বুঝতে হলে এই পটভূমিতে প্রায়-মানব ও প্রাচীন মানবের অভিযোজন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার অনুধাবন একান্ত আবশ্যক। এবং সেই কারণেই মানব বিজ্ঞানে, বিশেষত প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বে, প্লিস্টোসিন যুগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্লিস্টোসিন যুগের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে যদি মানব বিবর্তনের কাঠামোটা এক নজরে বিচার করা যায় তবে দেখা যায় যে প্লিস্টোসিনের শুরুতেই মানব গণ (Homo)-এর প্রত্যক্ষ পূর্বসুরী অস্ট্রালোপিথেকাসের আবির্ভাব ঘটেছে; মধ্য-প্লিস্টোসিন সময়ের প্রারম্ভেই গণ হোমোর উৎপত্তি হয়েছে, পিথেকান্থ্রোপাস জাতীয় জীবাশ্ম যার সাক্ষী; উচ্চ-প্লিস্টোসিনের প্রথমার্ধেই আধুনিক

বছর আগে	প্লিস্টোসিন যুগ	আবহাওয়া	সংস্কৃতি পর্যায় (পুরাতন প্রস্তর)		মানব বিবর্তন পর্যায়
10 হাজার	উচ্চ	উর্ম্ হিমবাহ কাল	[illegible]স্তর হাতিয়ার	অন্ত	
		রিস্-উর্ম্ আন্ত-হিমবাহ		মধ্য	হোমো স্যাপিয়েন্স্ স্যাপিয়েন্স্
	মধ্য	রিস্-হিমবাহ	চোকলা-হাতিয়ার	আদি পুরাতন প্রস্তর	হোমো স্যাপিয়েন্স্ নিয়ানডারথালেন্সিস্
		মিন্ডেল-রিস্ আন্ত-হিমবাহ	মুঠ পাথরের হাতিয়ার		
		মিন্ডেল হিমবাহ			
	নিম্ন	গুন্জ্-মিন্ডেল আন্ত-হিমবাহ	নুড়ি হাতিয়ার		হোমো ইরেক্টাস
		গুন্জ্ হিমবাহ			
25 লক্ষ		ভিলাফ্রাঙ্কিয়ান			অস্ট্রালোপিথেকাস

সারণি 2.2

মানুষের প্রজাতি হোমো স্যাপিয়েন্স-এর আবির্ভাব হয়েছে—নিয়ানডারথাল মানুষ যার প্রমাণ; এবং প্লিস্টোসিনের শেষাংশে সম্পূর্ণ আধুনিক মানুষের (Homo *sapiens sapiens*) উদ্ভব ঘটেছে—ক্রো-ম্যাগনন্ জাতীয় জীবাশ্ম যার প্রতিনিধি। সারণি নং 2. 2-এর মাধ্যমে প্লিস্টোসিনের বিভিন্ন পর্যায়, মানব সংস্কৃতি পর্যায় এবং মানব বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ের সম্পর্ক দেখানো হল।

প্লিস্টোসিন যুগে আবহাওয়ার এই অস্বাভাবিক প্রকৃতির কারণ এখনও সঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি; তবে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন দিক থেকে এই ঘটনা ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। এইসব ব্যাখ্যার মধ্যে পৃথিবীর কক্ষপথের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন, মেরুর অবস্থিতির পরিবর্তন, এবং সৌর-তাপ বিকিরণে তারতম্য উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করলে মনে হয়. কোন একটি কারণ দ্বারা তুষার যুগকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়—বরং সেটা একাধিক ঘটনার সম্মিলিত ফল।



3. প্রস্তর যুগের হাতিয়ার

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বে মানুষকে হাতিয়ার (tool) প্রস্তুতকারক প্রাণী হিসাবে সংজ্ঞাবদ্ধ করা হয়। এর নিহিতার্থ হচ্ছে যে, মানুষই একমাত্র প্রাণী যে তার নিজের প্রয়োজনানুযায়ী হাতিয়ার প্রস্তুত করে নিতে পারে। অন্যান্য অনেক প্রাণী, এমন কি কোন কোন পতঙ্গও, বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুকে নিজস্ব প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে—মানুষের নিকটতম আত্মীয় গোরিলা, শিম্পাঞ্জী, প্রভৃতি এপ-রা তো পারেই। কিন্তু মানুষই একমাত্র যে প্রাকৃতিক বস্তুকে শুধুমাত্র ব্যবহারই করতে পারে না, সচেতন শ্রমের মাধ্যমে কেটে-ছেঁটে, প্রয়োজন-মাফিক আকৃতি দিতে পারে, যার ফলে সেই প্রাকৃতিক বস্তুর গুণগত পরিবর্তন ঘটে—অর্থাৎ হাতিয়ার তৈরি করতে পারে। কাজেই, এই হাতিয়ার তৈরির ব্যাপারটাই মানুষকে সংস্কৃতিগতভাবে অন্যান্য সমস্ত প্রাণী থেকে এবং এপ-দের থেকে পৃথক করেছে।

প্রাচীন মানব-গোষ্ঠীর সংস্কৃতিচিহ্ন হিসাবে যেসব হাতিয়ারের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতিকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন হাতিয়ারকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে সেগুলো কিভাবে নির্মিত হয়েছে, সম্ভাব্য কি কাজে এবং কিভাবে সেগুলো ব্যবহৃত হত, তা অনুমান করা সম্ভব। সেইসঙ্গে, বর্তমান কালে যেসব আদিবাসী গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক বিচারে এখনও প্রস্তরযুগে অবস্থান করছে, তাদের হাতিয়ার নির্মাণ পদ্ধতি ও ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করে প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ারকে আরও নিশ্চিতরূপে বোঝা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া, লুইস লীকী (L. S. B. Leakey), ফ্রান্সিস্ বোর্দে (F.

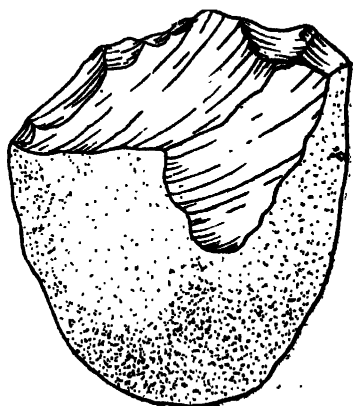
Bordes), প্রভৃতি প্রখ্যাত প্রত্নবিদগণ নিজেরা প্রাচীন মানবের অনুকরণে, হাতে-কলমে হাতিয়ার নির্মাণ করে বিভিন্ন অনুমানকে বিশ্বাসযোগ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

হাতিয়ার নির্মাণের আদি পর্বে যেসব 'হাতিয়ার' নির্মিত হয়েছে সেগুলোতে অপটুতার ছাপ প্রকট, এবং অনেকক্ষেত্রেই সাধারণ প্রাকৃতিক বস্তু থেকে পৃথক করে চেনা প্রায় অসম্ভব। সেইসব হাতিয়ার সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মত-পার্থক্য আছে। আমাদের আলোচনায় সেগুলো বর্জন করা হয়েছে।

পুরাতন প্রস্তর যুগের শুরু থেকে নব্যপ্রস্তর যুগ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে মোটামুটি যত প্রকারের হাতিয়ার পাওয়া গেছে এবং সর্বসাধারণে গৃহীত হয়েছে সেইসব হাতিয়ারের সরল এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে উল্লেখ করা হল।

পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতি :

1. নুড়ি হাতিয়ার (Pebble tool)—নুড়ি পাথরে তৈরি যেকোন হাতিয়ারকেই সাধারণভাবে নুড়ি হাতিয়ার বলা যায়, তবে বিশেষ অর্থে নুড়ি হাতিয়ার নামে অভিহিত করা হয় বিশেষ শ্রেণীর ছেদনী, চাঁচুনি, প্রভৃতি কতক-গুলি হাতিয়ারকে, যেগুলো আদি পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতিতেই সীমাবদ্ধ।

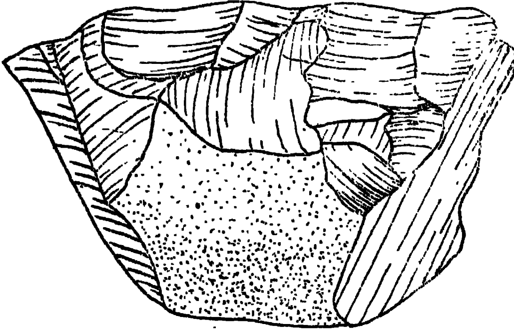

চিত্র 1

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সব হাতিয়ারের কেবলমাত্র কাজের প্রান্তে চোকলা তোলা, বাকী অংশে নুড়ির আদি-ত্বক (original cortex) বর্তমান। নুড়ি হাতিয়ারের প্রাচীনতম নিদর্শন পূর্ব

আফ্রিকার ওল্ডুভাই ও কাফু সংস্কৃতি থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে প্রাপ্ত নুড়ি পাথরে তৈরী হাতকুঠারকে নুড়ি হাতিয়ার প্রকারের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয় না।

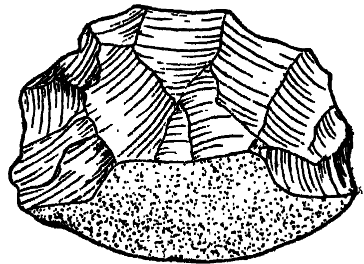
এইসব হাতিয়ার প্রধানত থেঁতলানো, কাটা ও চাঁচার কাজে ব্যবহৃত হত বলে অনুমান করা হয়। প্রকৃতপক্ষে নুড়ি হাতিয়ার-গুলো সম্ভাব্য এবং প্রয়োজনীয় সকলপ্রকার কাজেই ব্যবহৃত হত; কারণ সে যুগে এগুলোই ছিল একমাত্র হাতিয়ার।

2. **ছেদনী জাতীয় বা চপার ও চপিং-হাতিয়ার** (Chopper-chopping tool)—এইসব হাতিয়ার সাধারণত গোলাকার বা



চিত্র 2

ডিম্বাকার, এবং এক বা উভয় তল থেকে বড় ও অসমানভাবে চোকলা তোলা। সেই কারণে এগুলোর কাজের প্রান্ত আঁকা-বাঁকা বা তরঙ্গায়িত। এ জাতীয় হাতিয়ারগুলির মধ্যে যেগুলোর একটি তলে চোকলা তোলা এবং অন্য তল অবিকৃত, সেগুলোকে চপার; এবং যেগুলোর উভয় তল থেকেই চোকলা তোলা সে-গুলোকে চপিং হাতিয়ার বলা হয়।



চিত্র 3

এইসব হাতিয়ার প্রধানত নুড়ি পাথরে তৈরী, এবং অনেক-ক্ষেত্রে হাতিয়ারের ওপর নুড়ির আদিত্বক বর্তমান। আফ্রিকার ওল্ডুভাই এবং কাফু সংস্কৃতি ছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের (বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত) সোহান শিল্পে এ জাতীয় হাতিয়ারের সাক্ষাৎ মেলে।

অন্যান্য নুড়ি হাতিয়ারের মত ছেদনী জাতীয় হাতিয়ারও থেঁতলানো, কাটা, চাঁচা, প্রভৃতি সমস্ত রকম কাজে ব্যবহৃত হত বলে অনুমান করা হয়।

3. **হাতকুঠার** (Hand axe)—এই প্রকারের হাতিয়ার প্রধানত মূল পাথরে (core) তৈরি, যার উভয় তলই চোকলা তোলা। অধিকাংশ হাতকুঠারে একটি সরু, কখনও সূচালো, কাজের প্রান্ত, চওড়া ও ভারী ধরার প্রান্ত, এবং তরঙ্গায়িত বা প্রায়-ঋজু পার্শ্বরেখা বর্তমান।

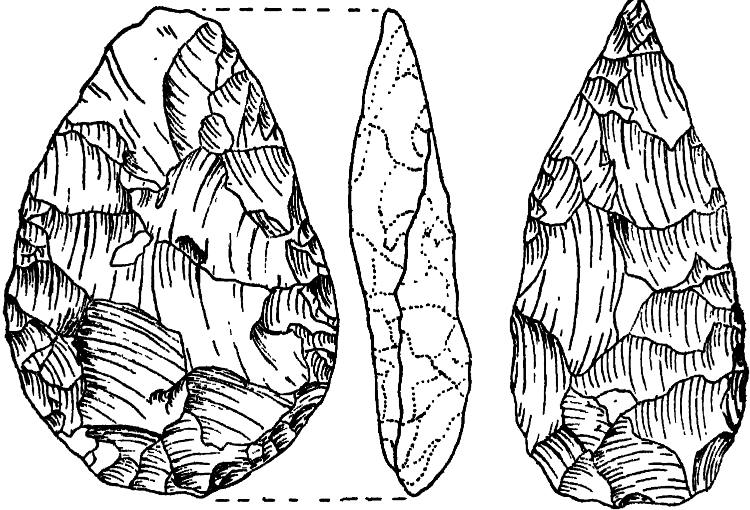
ইউরোপের সমগ্র আদি পুরাতন প্রস্তর এবং অধিকাংশ মধ্য পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতি, এবং আফ্রিকা ও ভারতের আদি প্রস্তর সংস্কৃতিতে এই হাতকুঠার প্রধান হাতিয়াররূপে বর্তমান ছিল। এই দীর্ঘ সময় ব্যাপী অবস্থিতির ফলে হাতকুঠারের বিভিন্ন প্রকার ও ক্রমিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে হাতকুঠার (ইউরোপের আবিভিলীয় শিল্প) মূলত বড়, ভারী এবং অসমান ভাবে চোকলা তোলা; এবং অনেক ক্ষেত্রেই, বিশেষত হাতলের অংশে, আদিত্বক বর্তমান। পরবর্তী পর্যায়ের নিদর্শন-গুলো স্বাভাবিকভাবেই অনেক উন্নত প্রযুক্তির পরিচায়ক—পাতলা,



চিত্র 4

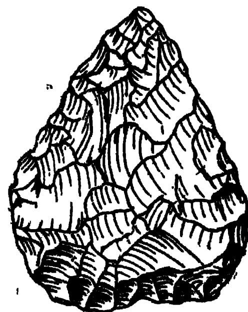
অনেক ক্ষেত্রে আকারে ছোট, চোকলা-তল (flake scar) অগভীর এবং ছোট, বিশেষত প্রান্তবর্তী এলাকায়।

আকৃতির ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার হাতকুঠারকে কয়েকটি



চিত্র 5 চিত্র 6

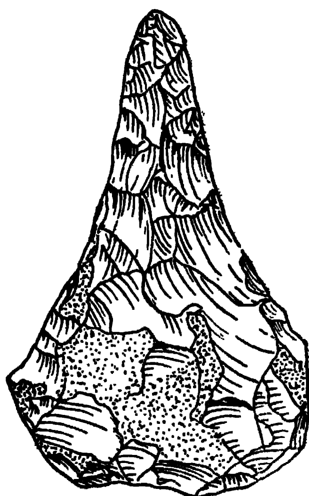
প্রকারে বিভক্ত করা হয়, যেমন ন্যাসপাতি আকৃতি (Pear shaped), ডিম্বাকৃতি (Ovate), বাঁশপাতাকৃতি (Lanceolate), বাদামাকৃতি (Almond), ত্রিভুজাকৃতি (Triangular), হৃদপিণ্ডাকৃতি (Cordiform), প্রভৃতি। আদি পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির গোড়ার দিকে ন্যাসপাতি আকৃতির হাতকুঠার, পরবর্তী পর্যায়ে ডিম্বাকৃতি (আস্যুলীয় শিল্প), এবং মধ্য পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতিতে অন্যান্য প্রকার হাতকুঠারের সাক্ষাৎ মেলে।



চিত্র 7

দীর্ঘ সময় ব্যাপী হাতকুঠার জাতীয় হাতিয়ারের উপস্থিতি প্রাগৈতিহাসিক মানবের জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা ও বিভিন্ন প্রকার কাজে উপযোগিতা নির্দেশ করে। অনুমান করা যায়, যে সংস্কৃতিতে হাত কুঠার দেখা গেছে সেখানে এটা একটা অপরিহার্য হাতিয়ার ছিল, যার দ্বারা কাটা-চেরা-খোড়া-চাঁচা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ নিষ্পন্ন হত। পরবর্তী কালের উন্নত হাতকুঠার দণ্ডের সঙ্গে লাগিয়ে বর্শা হিসাবেও ব্যবহৃত হত বোঝা যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হাতকুঠার নামটি যথাযথ নয়, কারণ আমাদের পরিচিত কুঠারের মত কাঠ কাটার কাজে এর ব্যবহার থাকলেও খুবই সীমিত। তাই কোন কোন বিশেষজ্ঞ এর কার্য-নির্দেশী (functional) নামের পরিবর্তে সাধারণ কোন নামের নির্দেশ দিয়েছেন।

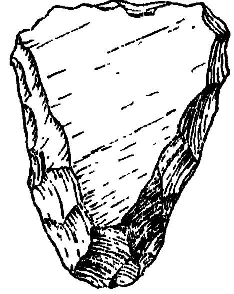


চিত্র 8

4. কর্তরী (Cleaver)—এই হাতিয়ার সাধারণত ইংরেজী U বা V-আকৃতি বিশিষ্ট, যার কাজের প্রান্ত অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন পার্শ্ব বা প্রান্ত-চোকলাতে (side or end-flake) তৈরি, যদিও নুড়ি পাথর বা অন্য মূল-পাথরের কর্তরীও প্রচুর সংখ্যায় বর্তমান। আকৃতির বিচারে এই হাতিয়ার পরবর্তী কালের ও আধুনিক কুঠার ফলার সঙ্গে তুলনীয়।

চোকলা পাথরে নির্মিত কর্তরীর কাজের প্রান্ত প্রধান চোকলা তলের (main flake surface) প্রান্ত এবং পৃষ্ঠ-তলের (dorsal surface) ঢালু চোকলা-তলের সমন্বয়ে গঠিত আর মূল পাথরের কর্তরী, উভয় তল থেকে চোকলা অপসারণের মাধ্যমে নির্মিত ; এবং

সে ক্ষেত্রে পৃষ্ঠ-তলের চোকলা-তল অধিকতর ঢালু এবং তা কাজের প্রান্তের সমান্তরালভাবে আঘাতের মাধ্যমে নির্মিত। অনেক ক্ষেত্রেই পৃষ্ঠ-তলে ঢালু আদি-ত্বক বর্তমান। আকৃতির বিভিন্নতা অনুসারে কর্তরী বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে, যথা, U-আকৃতি, V-আকৃতি, আয়তাকার, ট্রাপিজাকৃতি, বা কোন নির্দিষ্ট আকৃতি বিহীন।

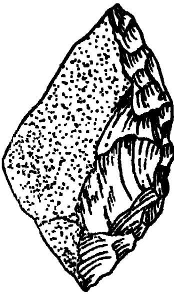


চিত্র 9

দক্ষিণ ও পূর্ব-আফ্রিকা এবং দক্ষিণ ভারতের আদি পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতিতে কর্তরী একটি প্রধান হাতিয়ার এবং হাত কুঠারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ইউরোপে এই হাতিয়ার প্রায় অনুপস্থিত।

কর্তরী মূলত কাটা ও চেরার কাজেই ব্যবহৃত হত বলে অনুমান করা হয়। আজও প্রস্তর সংস্কৃতিতে অবস্থিত কোন কোন মানব গোষ্ঠী কর্তরীর সাহায্যে শিকার করা প্রাণীর চামড়া ছাড়ায়।

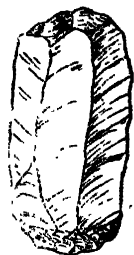
5. চাঁচুনি (Scraper)—হাতকুঠার বা কর্তরীর তুলনায় চাঁচুনি একটি ক্ষুদ্রাকার হাতিয়ার, যা সাধারণ চোকলা, ব্লেড-চোকলা বা উপযুক্ত কোন মূল পাথরে তৈরি। কাজের প্রান্তের ভিত্তিতে চাঁচুনির বিভিন্ন প্রকার দেখা যায় :



চিত্র 10

(ক) পার্শ্ব-চাঁচুনি—চোকলা অথবা মূল পাথরে তৈরি, দুইটি পার্শ্বরেখার একটি অপেক্ষাকৃত বেশী পাতলা, ধারালো ও উত্তল—এটি কাজের প্রান্ত। অপর পার্শ্বরেখা সাধারণত বৈশিষ্ট্যহীন বা ভোঁতা। কাজের প্রান্ত থেকে ছোট ছোট চোকলা তোলা। পৃষ্ঠ-তলে অনেক ক্ষেত্রে আদি-ত্বক বর্তমান। মধ্য পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতি, প্রধানত মুসতেরিয় সংস্কৃতিতে, এই প্রকার চাঁচুনির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

(খ) প্রান্ত-চাঁচুনি (End Scraper)—এই প্রকার চাঁচুনি সাধারণত চোকলায় বা ব্লেড-চোকলায় তৈরি, যার একটি বা উভয় প্রান্ত চাঁচুনি-প্রান্ত (scraping end)। কাজের প্রান্ত উত্তল এবং ধারালো, ও প্রধান চোকলা-তলের প্রান্ত এবং পৃষ্ঠ-তল থেকে ছোট ছোট চোকলা তোলার ফলে গঠিত। পার্শ্বরেখা সাধারণত ভোঁতা বা বৈশিষ্ট্যহীন এবং কাজের সুবিধামত ধরার উপযোগীরূপে তৈরি। ইউরোপের অন্ত পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির বিভিন্ন শিল্পে এ জাতীয় চাঁচুনির সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে।


চিত্র 11

(গ) গোলাকার চাঁচুনি (Round Scraper)—এই প্রকার চাঁচুনি গোলাকার বা ডিম্বাকার; মূলপাথর বা চোকলা-পাথরে তৈরি, যার পরিধির প্রায় সবটাই ধারালো এবং চাঁচার কাজে ব্যবহারের যোগ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে একটা ছোট অংশ মোটা ও ভোঁতা। পরিধি বরাবর ছোট ছোট চোকলা তোলা। মধ্য পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতি-স্তর থেকেই এ জাতীয় চাঁচুনির অধিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

(ঘ) চ্যাপ্টা তলদেশ বিশিষ্ট চাঁচুনি (Keeled Scraper)—এটি একটি বিশেষ ধরনের চাঁচুনি, যার তলদেশ চ্যাপ্টা এবং পৃষ্ঠ-তল অনেকটা উঁচু। ধারালো প্রান্তরেখা থেকে সরু, সমান্তরাল ও লম্বা চোকলা-তলসমূহ (flutings) পৃষ্ঠতলের উঁচু স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত। এর ফলে কাজের প্রান্তরেখা পাখার মত বিস্তৃত দেখায়। ইউরোপের অন্ত পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির অরিগন্যাকিয় শিল্পে এটি একটি বিশিষ্ট হাতিয়ার।


চিত্র 12

(ঙ) অবতল চাঁচুনি (Concave Scraper)—এই প্রকার

চাঁচুনি প্রধানত চোকলা-পাথরে তৈরি এবং কাজের প্রান্ত অবতল আকৃতির। কোন কোন ক্ষেত্রে দুইটি পার্শ্বরেখাই কাজের প্রান্ত। ফলে, এই দুই পার্শ্বরেখার মিলনে উদ্ভূত সুচালো প্রান্ত ছিদ্র করার কাজে উপযোগী। এই ধরনের চাঁচুনি আদি পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির ক্ল্যাক্টোনিয় শিল্পে পাওয়া গেছে। ভারতের মধ্য পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতিতেও এই চাঁচুনির প্রচুর সাক্ষাৎ মেলে। অনুমান করা হয়, এই প্রকার চাঁচুনি দ্বারা কাঠের দণ্ড সুচালো করে বর্শা তৈরি করা হত।

(চ) নাসিকা চাঁচুনি (Nose Scraper)—ইউরোপের অন্ত পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতিতে প্রাপ্ত এই ধরনের চাঁচুনির পৃষ্ঠতল থেকে এমনভাবে চোকলা তোলা হয়েছে যার 'ফলে এর আকৃতি অনেকটা নাসাগ্রসহ দুই নাসারন্ধ্রের আকৃতির সঙ্গে তুলনীয়। সেহেতু এই নামকরণ। চোকলা বা মূলপাথর উভয়ের উপরই এই চাঁচুনি তৈরি হয়েছে।

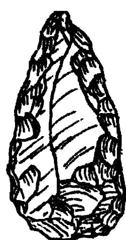


চিত্র 13

6. তীক্ষ্ণাগ্র (Point)—এই জাতীয় হাতিয়ার অবশ্যই ত্রিকোণাকৃতি, প্রায়-ত্রিকোণাকৃতি, বা পাতাকৃতি, তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ সম্পন্ন, বিপরীত প্রান্ত কোন কোন ক্ষেত্রে বর্দ্ধিত (tang) এবং ফলে এক বা দুই কাঁধ (shoulder) বিশিষ্ট। মধ্য থেকে অন্ত পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতি ব্যাপী বিভিন্ন প্রকার তীক্ষ্ণাগ্রের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে ইউরোপ, আফ্রিকা ও ভারত থেকে :

(ক) মুসতেরিয় তীক্ষ্ণাগ্র (Mousterian Point)—এগুলো সাধারণত ছোট, চোকলা-পাথরে নির্মিত এবং ত্রিকোণাকৃতি বা প্রায়-ত্রিকোণাকৃতি। প্রধান চোকলা-তলের আঘাত-স্ফীতি (bulb of percussion) এবং আঘাত-তল (striking platform) অবিকৃত; পৃষ্ঠতল মোটামুটিভাবে চোকলা তোলা এবং প্রান্তবর্তী এলাকা দ্বিতীয় পর্যায়ে চোকলা অপসারণের

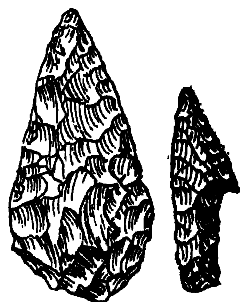
(secondary flaking) মাধ্যমে ধারালো করা। পশ্চিম ইউরোপের মুসতেরিয় সংস্কৃতিতে এই তীক্ষ্ণাগ্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতের মধ্য পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতিতেও এ জাতীয় তীক্ষ্ণাগ্রের নিদর্শন পাওয়া গেছে।



চিত্র 14

(খ) কাঁধযুক্ত তীক্ষ্ণাগ্র (Shouldered Point)—এ জাতীয় তীক্ষ্ণাগ্র সাধারণত সরু ও লম্বাটে চোকলাতে নির্মিত এবং কেবলমাত্র পৃষ্ঠতল থেকে চোকলা তোলা, অঙ্কতল প্রধান চোকলা তল। তীক্ষ্ণ কাজের প্রান্তের বিপরীত প্রান্তে বর্দ্ধিত অংশের উপস্থিতির ফলে একটি বা দুইটি কাঁধের উদ্ভব হয়েছে। ইউরোপের অন্ত পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির অরিগন্যাকিয় ও গ্রাভেতিয়, শিল্পে এবং পরবর্তী সলুত্রিয় শিল্পের প্রথম ভাগে এ জাতীয় তীক্ষ্ণাগ্রের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে।

(গ) পাতাকৃতি তীক্ষ্ণাগ্র (Leaf-shaped Point)—এ জাতীয় তীক্ষ্ণাগ্র দুরকমের—লরেল গাছের পাতার মত এবং উইলো গাছের পাতার মত। এই তীক্ষ্ণাগ্রগুলির উভয় প্রান্তই কমবেশি সূচালো। লরেল-পাতাকৃতি তীক্ষ্ণাগ্রের উভয় তল থেকেই চোকলা তোলা, কিন্তু উইলো-পাতাকৃতি তীক্ষ্ণাগ্রের কেবলমাত্র পৃষ্ঠতল থেকে চোকলা তোলা, অঙ্কতলের প্রধান চোকলা-তল অবিকৃত। লরেল ও উইলো পাতাকৃতি তীক্ষ্ণাগ্রের মধ্যে প্রথমটি আকৃতিতে কিছু বড়। পাতাকৃতি তীক্ষ্ণাগ্রের চোকলা-তলগুলি ছোট, অগভীর এবং অনেকক্ষেত্রেই প্রায় সমান্তরাল—স্পষ্ট বোঝা যায় যে চাপ পদ্ধতিতে ওই সব চোকলা তোলা হয়েছে। পাতাকৃতি তীক্ষ্ণাগ্র সলুত্রিয় শিল্পের বিশেষ হাতিয়ার।

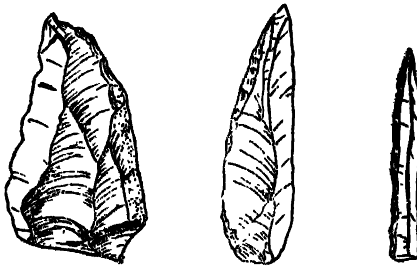


চিত্র 15

সব রকমের তীক্ষ্ণাগ্রই কোন দণ্ডে যুক্ত করে বর্শা বা সমতুল কোন ক্ষেপনাস্ত্রের ফলারূপে ব্যবহৃত হত বলে অনুমান করা হয়।

7. **ছুরি-ব্লেড** (Knife-Blade)—এই ধরনের হাতিয়ার প্রধানত ব্লেড-চোকলায় নির্মিত ছুরি। ইউরোপের অন্ত পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির পেরিগর্ডিয় ও অরিগন্যাকিয় শিল্পে এই জাতীয় ছুরির উপস্থিতি সমধিক, বিশেষত নিম্ন ও উচ্চ পেরিগর্ডিয় শিল্পে। প্রকারের বিভিন্নতা অনুসারে বিভিন্ন ধরনের ছুরি-ব্লেডের সাক্ষাৎ মেলে ঃ

(ক) **অডি ছুরি-ব্লেড** (Audi Knife-Blade)—এগুলো ছোট চোকলা হাতিয়ার যার অঙ্কতল প্রধান চোকলা-তল এবং পৃষ্ঠতলে কয়েকটি সরু ও লম্বা চোকলা-তল বর্তমান। এদের মধ্যে একটি চোকলা-তল ঢালু হয়ে অঙ্কতলের প্রান্তের সঙ্গে মিলিত হয়ে ধারালো কাজের প্রান্ত তৈরি করেছে। বিপরীত পার্শ্বরেখা কিছুটা বাঁকা ও ভোঁতা—যাতে ব্যবহারের সময় সেখানে আঙুল রাখা যেত। নিম্ন-পেরিগর্ডিয় শিল্পে এ ধরনের ছুরি-ব্লেডের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে।



চিত্র 16

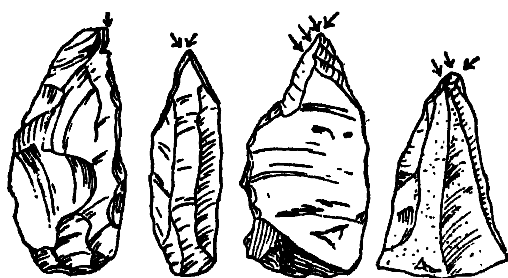
(খ) **শ্যাটেলপেরন ছুরি-ব্লেড** (Chatelperron Knife-Blade)—এই প্রকার ছুরি-ব্লেডকে অডি ছুরি-ব্লেডের উন্নত সংস্করণরূপে বিবেচনা করা হয়,—আকারে ক্ষুদ্রতর, আরও সরু

এবং অধিকতর যত্নসহকারে নির্মিত, পৃষ্ঠতলের সরু চোকলা-তলগুলো চাপ পদ্ধতিতে উৎপন্ন বলে বোঝা যায়।

(গ) গ্রাভেত ছুরি-ব্লেড (Gravette Knife-Blade)—এই ছুরি-ব্লেড সাধারণত ছোট এবং খুব সরু। এর কাজের প্রান্ত অত্যন্ত ধারালো, অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ অথবা ভোঁতা-প্রান্তের সমান্তরালভাবে চওড়া। পেরিগর্ডিয় শিল্পের শেষ পর্যায়ে এই প্রকার ছুরি-ব্লেডের অস্তিত্ব ছিল।

সবরকমের ছুরি-ব্লেডই অত্যন্ত ভালভাবে কাটার কাজে উপযুক্ত। ছোট গ্রাভেত ছুরিগুলো সম্ভবত কোন হাতলের সঙ্গে লাগিয়ে ব্যবহার করা হত। বাকীগুলো শুধু হাতে ব্যবহারের উপযুক্ত।

৪. খোদক (Graver/Burin)—এগুলো একধরনের ছোট হাতিয়ার, সাধারণত চোকলা বা ব্লেড-চোকলাতে তৈরি, আবার কখনো কখনো মূল পাথরেও হয়ে থাকে। এই হাতিয়ারের বৈশিষ্ট্য কাজের প্রান্তে—তী অথচ চওড়া, অনেকটা স্ক্রু-ড্রাইভারের



চিত্র 17

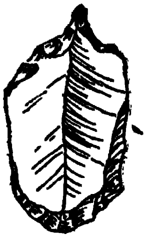
কাজের প্রান্তের মত। বিশেষ পদ্ধতিতে চোকলা তোলার ফলে এই ধরনের কাজের প্রান্ত সৃষ্টি হয়, এবং সেই চোকলা-তলকে তাই খোদক-চোকলা-তল (graver facet) বলে। কাজের প্রান্তে কোন তীক্ষ্ণাগ্র দণ্ডের সাহায্যে উল্লম্বভাবে আঘাতের দ্বারা এ জাতীয় চোকলা-তল তৈরি করা হয়।

অন্ত পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতিতে খোদক একটি উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার। সেই কারণে সে-যুগের বিভিন্ন শিল্পে নানা ধরনের খোদকের সাক্ষাৎ মেলে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রকারেরও উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়।

সঙ্গত কারণেই অন্ত পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতিতে খোদকের বিকাশ ঘটেছিল, কারণ সেই সময়ে হাড়, শিং এবং সম্ভবত কাঠ দিয়ে হাতিয়ার তৈরির ক্ষেত্রে এবং চারুশিল্পে খোদাইয়ের কাজে এর প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য।

বহু প্রকারের খোদকের পরিচয় পাওয়া গেছে, কিন্তু কোন একটি বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে সেগুলোর শ্রেণীবিভাগ সম্ভব নয়। কয়েকটি খোদকের নাম এখানে উল্লেখ করা হল ঃ সাধারণ, কোণাচে (angular), স্ক্রু-ড্রাইভারের প্রান্ত সদৃশ, তির্যক (oblique) ' চ্যাপ্টা, বহুতল (multifacet)-বিশিষ্ট, চঞ্চু আকৃতির (beaked), প্রভৃতি।

9. ছিদ্রক (Awl)—এগুলো সাধারণত ছোট হাতিয়ার, যার অগ্রভাগ সুচালো ও মোটা। মূলপাথর বা চোকলা—দুরকমের ছিদ্রকই পাওয়া গেছে, তবে উভয় ক্ষেত্রেই কাজের সুচালো প্রান্ত ছোট ছোট চোকলা অপসারণের মাধ্যমে নির্মিত। চোকলা পাথরে তৈরি ছিদ্রকের অঙ্কতল অধিকাংশক্ষেত্রেই অবিকৃত প্রধান চোকলা-তল। কোন কোন ছিদ্রকের উভয় প্রান্তই সুচালো, সেগুলো সাধারণত ব্লেড-চোকলায় তৈরি। এ ছাড়া, এমন নিদর্শনও বিরল নয় যার একপ্রান্ত চাঁচুনি ও অপর প্রান্ত ছিদ্রক। ইউ-রোপের অন্ত পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতি ব্যাপী এবং ভারতের মধ্য প্রস্তর সংস্কৃতিতে ছিদ্রক জাতীয় হাতিয়ারের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে।



চিত্র 18

নাম ও আকৃতি থেকে সহজেই বোঝা যায় যে এ জাতীয় হাতিয়ার প্রধানত ছিদ্র করার কাজে ব্যবহৃত হত। অন্ত পুরাতন

প্রস্তর সংস্কৃতিতে হাড়, শিং, কাঠ, চামড়া ইত্যাদি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য ছিদ্র করার প্রয়োজন হত।

এ পর্যন্ত পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতি স্তর থেকে পাওয়া বিভিন্ন পাথরের হাতিয়ারের বর্ণনা দেওয়া হল। পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির শেষ পর্যায়ে, অর্থাৎ অন্ত পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতিতে, বিশেষত ইউরোপে, নানা ধরনের অ-প্রস্তর হাতিয়ারের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে হাড়, হরিণের শিং, হাতির দাঁত প্রভৃতি বস্তু-নির্মিত হাতিয়ার উল্লেখযোগ্য। নীচে সেইসব হাতিয়ারের বিবরণ দেওয়া হল:

10. **হাড়ের বর্শা ফলক** (Bone Lance-Point)—এই জাতীয় হাতিয়ার লম্বাটে হাড়ের টুকরোতে তৈরি, যার এক প্রান্ত তীক্ষ্ণাগ্র এবং অপর প্রান্ত প্রশস্ত এবং ছিলেকাটা (bevelled) বা চেরা (forked বা split)। চেরা প্রান্ত আবার দুরকমের —চেরার দুপাশের অংশ সমান, অধিকতর বিচ্ছিন্ন, এবং চেরা অংশ অগভীর; অথবা, চেরার দুপাশের অংশ অসমান কিন্তু কাছা-কাছি অবস্থিত এবং চেরা অংশ গভীর। ছিলেকাটা ফলকগুলোর কোনটা একপাশ কোনটা-বা দুপাশে ছিলে কাটা।



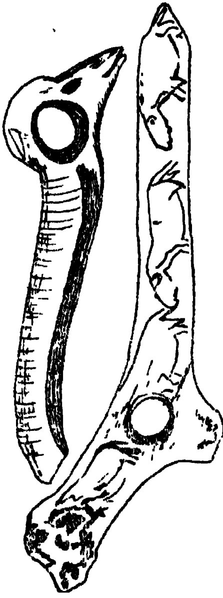
চিত্র 19

কোন উপযুক্ত দণ্ডের সঙ্গে যথাযথভাবে যুক্ত করে এইসব হাতিয়ার বর্শা-ফলক (spear/lance head) হিসাবে ব্যবহৃত হত। দণ্ডে সংযুক্তির কৌশল অনুসারে এগুলোর নীচের প্রান্ত চেরা বা ছিলে কাটা হত।

অন্ত পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির পেরিগর্ডিয়, অরিগন্যাকিয় ও ম্যাগডালেনিয় শিল্পে এই হাতিয়ারের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

11. **শাসন দণ্ড বা জাদু দণ্ড** (Baton de Comman-

dement)—অন্ত পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির অরিগন্যাকিয় শিল্পে হরিণের শিং-এ নির্মিত এইসব হাতিয়ার প্রথম দেখা যায়। পরে ম্যাগডালেনিয় শিল্পে তা আরও ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়।



চিত্র 20

এ জাতীয় হাতিয়ার বিভিন্ন প্রকারের। সাধারণ বৈশিষ্ট্যরূপে, প্রত্যেকটিতেই এক বা একাধিক ছিদ্র বর্তমান, এবং কিছু-না-কিছু খোদাই সম্বলিত। ছিদ্রগুলো আকারে ছোট বা বড়, গোলাকার বা ডিম্বাকার। খোদাইগুলো কখনো শুধুমাত্র কিছু রেখা সম্বলিত, কখনো-বা সে যুগের প্রাণীর প্রতিলিপি। কোন কোন নিদর্শন অত্যন্ত সুন্দরভাবে নির্মিত।

এসব হাতিয়ার ঠিক কি কাজে ব্যবহৃত হত সে সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে বিভিন্ন নমুনা সম্ভবত বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হত—যেমন, বড় ছিদ্রগুলোর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে কোন বাঁকা দণ্ডকে সোজা করা হত; অথবা তাঁবুর চামড়া আটকানোর কাজে ব্যবহৃত হত; ছোট নিদর্শনগুলো সম্ভবত চামড়ার পোষাক আটকানোর জন্য ব্যবহার করা হত; ছোট এবং সুন্দর ভাবে খোদাই করা নমুনাগুলো দলপতির দণ্ড হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। অপরদিকে, সে যুগের চারুকলা বিশ্লেষণে যে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া-কলাপের কথা জানা যায়, তা থেকে অনুমান করা হয় যে, এই হাতিয়ারগুলো সম্ভবত জাদু-দণ্ড রূপেও ব্যবহৃত হত। এই সমস্ত ব্যাখ্যাই সম্ভাবনা ভিত্তিক। তবে আধুনিককালের কোন কোন আদিবাসী সম্প্রদায় অনুরূপ হাতিয়ার দিয়ে তীরের

দণ্ড সোজা করে থাকে। যে কাজেই ব্যবহৃত হয়ে থাকুক এই হাতিয়ার যে অন্ত পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতিতে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তা নিশ্চিতরূপে বলা যায়।

12. হারপুন (Harpoon)—এ জাতীয় হাতিয়ার হরিণের শিং-এ নির্মিত, লম্বাটে আকৃতির, এক বা উভয় প্রান্ত সূচালো। এগুলোর গায়ে খাঁজ কাটা বা গা থেকে দুপাশে সূচালো কাঁটা (barb) অভিক্ষিপ্ত। কাঁটা এক বা একাধিক হতে পারে। কোন কোন নিদর্শনে কাজের বিপরীত প্রান্ত উঁচু বর্তনী (collar)-সম্বলিত।

এই হাতিয়ার উপযুক্ত দণ্ডে সংযুক্ত করে মাছ বা জলজ প্রাণী শিকারে বিশেষ প্রকার বর্শার মত ব্যবহার করা হত বলে বোঝা যায়। ম্যাগডালেনিয় শিল্পে (অন্ত পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির শেষ শিল্প) বিভিন্ন প্রকার হারপুনের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে, যা থেকে অনুমান করা হয় যে সেই সময়ে মৎস্য শিকার একটি প্রধান জীবিকারূপে গৃহীত হয়েছিল। বিভিন্ন প্রকার হারপুনের মধ্যে একটা ক্রমিক উন্নতিও লক্ষ্য করা যায়—



চিত্র 21

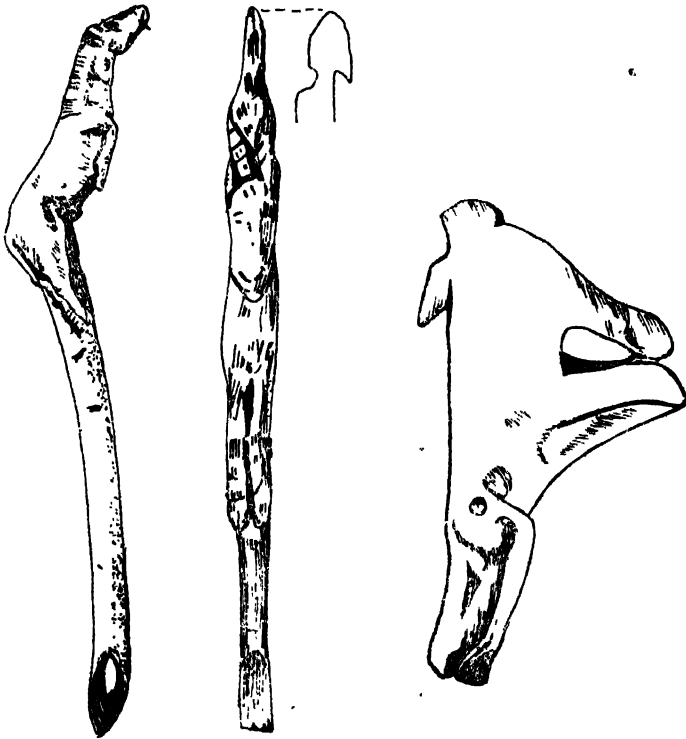
ক) ক্ষুদ্রকায়, দেহ খাঁজ যুক্ত এবং কাজের বিপরীত প্রান্তের কাছে গাঁটের (knob) আভাস ;

খ) ক্ষুদ্রকায়, একটি কাঁটা যুক্ত এবং বিপরীত প্রান্তের কাছে উঁচু বর্তনী সম্বলিত ;

গ) মাঝারি আকৃতি বিশিষ্ট এবং দুপাশে দুটি কাঁটা ;

ঘ) দৈর্ঘ্য বরাবর একাধিক কাঁটা যুক্ত—যুগ্মভাবে বা পর্যায়-ক্রমে অবস্থিত ; এবং বিপরীত প্রান্তের কাছে উন্নত বর্তনী।

13. বর্শা ক্ষেপনী (Spear Thrower)—এগুলো হাড় বা হরিণের শিং-এ তৈরি লম্বাটে হাতিয়ার, যার এক প্রান্তে একটি খাঁজ বর্তমান। এগুলো অনেক ক্ষেত্রেই কোন জন্তুর আকৃতিতে নির্মিত, বা সুন্দর খোদাই দ্বারা সজ্জিত। ছোট ও বড় দুই আকারের বর্শা ক্ষেপনী পাওয়া গেছে। অনুমান করা হয়, বড়গুলো দিয়ে বর্শা নিক্ষেপ করা হত, আর ছোটগুলো ব্যবহার করা হত ছোট বর্শা বা বল্লম (dart) নিক্ষেপ করার জন্য। অন্ত পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির ম্যাগডালেনিয় শিল্পে এই হাতিয়ার একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল।



চিত্র 22

14. সূচ (Needle)—ম্যাগডালেনিয় শিল্পে বড়, ছোট, সরু, মোটা, নানা ধরনের সূচ পাওয়া গেছে যেগুলো সাধারণত হাড়ের তৈরি। এগুলো সরু ও লম্বা আকৃতির, দুই প্রান্তের মধ্যে একটি বেশি সূচালো, অপর প্রান্ত ছিদ্রযুক্ত হতে পারে, বা না হতে পারে। বলা বাহুল্য, এসব সূচ সেলাই (চামড়া প্রভৃতি) করার কাজে ব্যবহৃত হত। সেযুগের মানুষ যে পোষাকের ব্যবহার করত এটি তার একটি নিশ্চিত পরোক্ষ প্রমাণ।



চিত্র 23

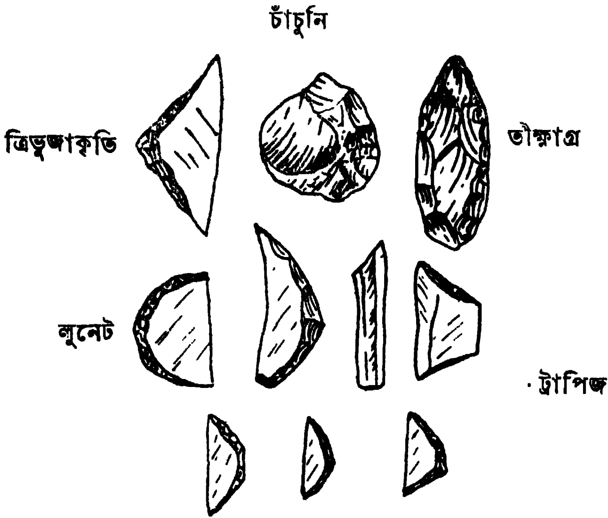
মধ্য প্রস্তর সংস্কৃতি

1, খুদে হাতিয়ার (Microliths)—এ ধরনের হাতিয়ার ছোট এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরু চোকলার ওপর নির্মিত ; কখনো এক বা একাধিক প্রান্ত দ্বিতীয় পর্যায়ে চোকলা অপসারণের মাধ্যমে ভোঁতা করা। কিন্তু সাধারণত কোন তলেই দ্বিতীয় পর্যায়ে চোকলা তোলা নয়। নানা প্রকারের খুদে পাথরের হাতিয়ার পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্য প্রস্তর সংস্কৃতির চিহ্ন হিসাবে আবিষ্কৃত হয়েছে। তাদের মধ্যে কোনটা-বা জ্যামিতিক আকৃতির কোনটা আবার নির্দিষ্ট আকৃতি বিহীন। ইউরোপের (পশ্চিম) টারডেনয়সিয় শিল্পে খুদে হাতিয়ারের প্রচুর সাক্ষাৎ মেলে। আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকেও এ জাতীয় হাতিয়ারের অনেক সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। নীচে কয়েকটি প্রধান প্রধান খুদে হাতিয়ারের পরিচিতি দেওয়া হল :

ক) অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি (Lunate বা Crescent)—এগুলো অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি খুদে হাতিয়ার—এক পাশ সোজা ও ধারালো এবং অন্য পাশ অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে বাঁকানো। বাঁকা অংশ মোটা এবং ছোট ছোট চোকলা তোলা। অঙ্কতল প্রধান চোকলা-তল এবং পৃষ্ঠতলে এক বা একাধিক চোকলা-তল বর্তমান। সাধারণভাবে

ছোট ও প্রশস্ত নমুনাগুলোকে লুনেট এবং সরু ও লম্বাটে নমুনা-গুলোকে ক্রিসেন্ট বলে। এগুলোর প্রান্তদ্বয় তীক্ষ্ণ হতে পারে বা না-ও হতে পারে।

খ) ত্রিভুজাকৃতি (Triangular)—এগুলো প্রায় ত্রিভুজাকৃতি খুদে হাতিয়ার। যার একটি বাহু ধারালো এবং অপর দুই বাহু সম্পূর্ণ বা আংশিক ভোঁতা। ত্রিভুজগুলো অধিকাংশই সমবাহু বা সমদ্বিবাহু প্রকারের।



চিত্র 24

গ) ট্রাপিজ (Trapeze)—যেসব খুদে হাতিয়ারের দুই বিপরীত বাহু সমান্তরাল, কিন্তু অপর দুই বাহু সমান্তরাল নয়, তাদের ট্রাপিজ বলে। সমান্তরাল বাহু দুটির মধ্যে যেটি বড় সেটিই ধারালো, অর্থাৎ কার্যকরী বাহু। অসমান্তরাল বাহু দুটো প্রায়ই মোটা এবং ছোট ছোট চোকলা অপসারণের মাধ্যমে ভোঁতা করা। কোন তলেই দ্বিতীয় পর্যায়ে চোকলা অপসারণের কোন চিহ্ন নেই।

যে চতুর্ভুর্জ খুদে হাতিয়ারগুলোর কোন দুটি বাহুই সমান্তরাল নয় সেগুলোকে ট্রাপিজয়েড (Trapezoid) বলে। ট্রাপিজয়েড-গুলো সাধারণত দুই প্রকারের—

১) কলমকাটা ছুরি আকৃতির তীক্ষ্ণাগ্র (Pen-knife Point) —এগুলো সরু ব্লেড-চোকলায় নির্মিত যার ওপর দ্বিতীয় পর্যায়ে তির্যকভাবে চোকলা তোলা। প্রাথমিক চোকলা-তলের দ্বারা ধারালো কাজের প্রান্ত নির্মিত।

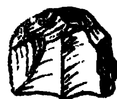
২) অনুপ্রস্থ তীরাগ্র (Transverse Arrowhead)— এগুলো লম্বা ধরনের ট্রাপিজয়েড—দুই সমান্তরাল বাহুর বড়টি কাজের প্রান্ত এবং ধারালো; দুই অসমান্তরাল বাহু পুরু এবং বিশেষভাবে চোকলা তুলে ভোঁতা করা।

ঘ) অবতল-মূল তীক্ষ্ণাগ্র (Hollow-base Point)—এগুলো ছোট ত্রিকোণাকৃতি হাতিয়ার যার মূল (base) অবতল। কোন কোন নমুনায় মূল ছাড়া অপর এক বাহু ভোঁতা করে তৈরি।

ঙ) খুদে খোদক (Micro Burin)—এগুলো ছোট চোকলা বা ব্লেড-চোকলায় তৈরি, যার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগে খোদক চোকলা-তল বর্তমান। আকারে ও ব্যবহারে এগুলো অন্ত পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির খোদকের অনুরূপ।

চ) চাঁচুনি (Scraper)—বিভিন্ন প্রকার চাঁচুনি খুদে হাতিয়ার সামগ্রীর মধ্যে পাওয়া গেছে—পার্শ্ব, প্রান্ত, উত্তল, অবতল এবং অঙ্গুষ্ঠ নখাকৃতি (thumb nail) চাঁচুনি উল্লেখযোগ্য।

এইসব খুদে হাতিয়ারগুলি এতই ছোট যে অধিকাংশই শুধু হাতে ব্যবহারের অযোগ্য; এবং প্রমাণিত হয়েছে যে উপযুক্ত দণ্ড বা হাতলে যথাযথ ভাবে লাগিয়ে এগুলোকে ব্যবহার করা হত। দণ্ড হিসাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাঠ, হাড় ও শিং-এর টুকরো ব্যবহৃত হয়েছে।



চিত্র 25

একাধিক লুনেট বা ক্রিসেণ্টকে এমনভাবে কোন দণ্ডে লাগানো হত যাতে একটি লম্বা, ধারালো প্রান্ত পাওয়া যায়। উদ্দেশ্য অনুযায়ী দণ্ড নির্বাচন করা হত— ছুরি প্রভৃতির জন্য সোজা দণ্ড, আবার কাস্তে জাতীয় হাতিয়ারের জন্য বাঁকা দণ্ড। এ জন্য দণ্ডের দৈর্ঘ্য বরাবর খাঁজ কাটা হত, হাতিয়ারগুলোর মোটা ও ভোঁতা প্রান্ত সেই খাঁজের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হত, আর সেগুলোকে শক্তভাবে আটকানোর জন্য রেজিন জাতীয় প্রাকৃতিক আঠা ব্যবহার করা হত। এইভাবে লাগানোর ফলে নির্মিত হাতিয়ারটিতে একটি একটানা ধারালো প্রান্ত পাওয়া যেত।



চিত্র 26

ত্রিভুজাকৃতি খুদে হাতিয়ারগুলো অধিকাংশই ব্যবহৃত হত হারপুনের কাঁটা (barb) তৈরির কাজে। হাড় বা শিং-এর একটি সোজা দণ্ডের একপাশে বা দুপাশে খাঁজ কেটে তার ভিতর ত্রিভুজাকৃতি হাতিয়াগুলোর ভোঁতা দিক ঢুকিয়ে শক্ত করে এঁটে দেওয়া হত, যাতে সূচালো প্রান্ত নীচের দিকে মুখ করে থাকে আর উপরে থাকে ত্রিভুজের ধারালো বাহু।

অধিকাংশ ট্রাপিজ সম্ভবত ব্যবহৃত হত তীরের ফলারূপে, তবে সেগুলো অনুপ্রস্থ। এ ছাড়া কোন কোন নমুনা ছেনির মাথা হিসাবেও ব্যবহার করা হত বলে অনুমান করা হয়।

সমস্ত খুদে হাতিয়ারই দণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করে ব্যবহৃত হত একথা মনে করা সঙ্গত নয়। কিছু চাঁচুনি, ব্লেড বা খোদক সম্ভবত শুধু হাতেই ব্যবহার করা হত।

খুদে হাতিয়ার ছাড়া মধ্য প্রস্তর সংস্কৃতিতে অন্যান্য হাতিয়ারও পাওয়া গেছে যেগুলোও পাথর এবং হাড় বা শিং-এর তৈরি।

2. গাঁইতি (Pick)—এই হাতিয়ার বড় নুড়ি পাথরে তৈরি। পৃষ্ঠতল থেকে স্থূলভাবে চোকলা তুলে একটি প্রান্ত মোটামুটি তীক্ষ্ণ করা হত, অপর প্রান্ত মোটা, ভারী এবং অনেকক্ষেত্রে নুড়ির আদি-ত্বক বর্তমান। অঙ্কতলে সাধারণভাবে কোন চোকলা তোলা হতনা —সেজন্য এ জাতীয় হাতিয়ার তৈরির জন্য একপিঠ চ্যাপ্টা বা অবতল নুড়ি নির্বাচন করা হত।

এ ধরনের হাতিয়ার যে মাটি খোঁড়ার কাজে ব্যবহৃত হত তা সহজেই বোঝা যায়। ইউরোপীয় মধ্য প্রস্তর সংস্কৃতির লারনিয় ও আস্তুরিয় শিল্পে এ জাতীয় গাঁইতির সাক্ষাৎ মেলে।

3. কুঠার (Axe)—ফ্লিন্ট পাথরের টুকরো বা আধখানা নুড়ি (pebble-half)-তে এ জাতীয় কুঠার তৈরি হত, যার পৃষ্ঠতলের এক প্রান্ত থেকে বড় চোকলা তুলে ধারালো প্রান্ত তৈরি করা।

এরকম কুঠার মধ্য প্রস্তর সংস্কৃতির ক্যাম্পিগনিয় শিল্প থেকে পাওয়া গেছে। গাছ কাটা ও মাটি কোপানোর কাজে এগুলো উপযোগী ছিল।

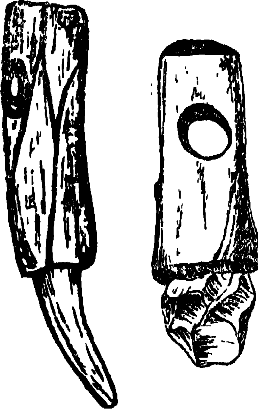
4. হারপুন—অন্ত পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির মত মধ্য প্রস্তর সংস্কৃতিতেও প্রচুর সংখ্যক হারপুন পাওয়া গেছে। তবে এগুলো তত সুন্দরভাবে নির্মিত নয়। অধিকাংশই চ্যাপ্টা, কাঁটাগুলো খাঁজের মত কাটা—গা থেকে বেশী অভিক্ষিপ্ত নয়, এবং বেশীরভাগ নমুনাতে নীচের প্রান্ত ছিদ্র যুক্ত।

সমগ্র মধ্য প্রস্তর সংস্কৃতি জুড়েই হারপুন পাওয়া গেছে, তবে অধিকাংশই ম্যাগ্‌লে-মোসিয় শিল্পের অন্তর্গত।



চিত্র 27

5. **সছিদ্র শিং-এর হাতিয়ার এবং হাতলসমূহ**—সমগ্র মধ্য প্রস্তর সংস্কৃতিতে, বিশেষত, লিংবি, ম্যাগ্‌লেমোস, প্রভৃতি শিল্পে, হরিণের শিং-এর বিভিন্ন প্রকার হাতিয়ার এবং হাতল পাওয়া গেছে। প্রায় সবক্ষেত্রেই সেগুলো সছিদ্র। শিং-এর গোড়ার দিকের অংশই বেশির ভাগ কাজে লাগানো হয়েছে, কারণ এই অংশ যথেষ্ট মোটা এবং শক্ত। যেগুলো হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোর একপ্রান্ত ঢালু করে কেটে কাজের প্রান্তরূপে তৈরি করা এবং দেহে দণ্ড লাগানোর জন্য ছিদ্র করা। আবার যেগুলো অন্য (পাথরের) হাতিয়ারের হাতলরূপে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোর দেহেও আর একটি বড় হাতল ঢোকানোর ছিদ্র করা। এইসব হাতিয়ার এবং হাতল কুঠার, কোদাল বা বাটালি রূপে, বা তাদের হাতলরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে, সেই অনুযায়ী ছিদ্রগুলো কাজের প্রান্তের অনুসারী বা আড়াআড়িভাবে বিন্যস্ত।



চিত্র 28

6. **চিত্রিত নুড়ি** (Painted Pebbles)—মধ্য প্রস্তর সংস্কৃতির প্রথমভাগে, অর্থাৎ পশ্চিম ইউরোপের আজিলিয় শিল্পে, বিভিন্ন প্রকার চিত্রিত নুড়ি পাথর পাওয়া গেছে। এগুলো অবশ্য কোন হাতিয়ার নয়; তবে সম্ভাব্য কি কাজে যে এগুলো ব্যবহৃত হত তা নিশ্চিতভাবে নিরূপন করা সম্ভব হয় নি। এগুলো মুদ্রা, তাবিজ-কবচ, প্রভৃতি যে কোন বস্তু হিসাবে বা অলঙ্কার হিসাবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে।



চিত্র 29

নব্য প্রস্তর সংস্কৃতি

1. **খনিত্র ফলক/কুঠার ফলক** (Celt/Axehead)—এই হাতিয়ার-গুলো U বা V-আকৃতিবিশিষ্ট; কাজের প্রান্ত প্রশস্ত, ধারালো, এবং সোজা বা উত্তল; বিপরীত প্রান্ত (হাতল) অপেক্ষাকৃত সরু। সাধারণত মিহি দানা-বিশিষ্ট শক্ত কোন পাথরে (যেমন, epi-diorite) এগুলো তৈরি,—তা আগ্নেয়শিলা বা স্তরীভূত শিলাও হতে পারে। কিন্তু ফ্লিন্টের মত নরম পাথর একেবারেই উপযুক্ত নয়। তবে, যেসব স্থানে ফ্লিন্ট ছাড়া অন্য কোন পাথর সাধারণভাবে পাওয়া যায় না, সেসব স্থানে এই হাতিয়ার ফ্লিন্টেই তৈরি হয়েছে।

এই ফলকগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে শুধুমাত্র চোকলা তুলে তৈরি করা হয়েছে; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘসা ও মসৃণ করা।

ব্যবহারের বিভিন্নতা অনুসারে বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির ফলকের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। যেগুলো কুঠারের মত ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোর উভয় তল ঢালু করে ধারালো কাজের প্রান্ত



চিত্র 30

নির্মিত হয়েছে। আর, যেগুলো কোদাল বা বাটালির কাজে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোর অঙ্কতল প্রায় সমতল বা সামান্য ঢালু, কিন্তু পৃষ্ঠতলের কাজের প্রান্ত বিশেষরূপে ঢালু করে নির্মিত (bevelled)। T-অক্ষরাকৃতি বিশিষ্ট যে বিশেষ ধরণের বাটালি (বা বাইস)-এর ফলা পাওয়া গেছে সেগুলোর কাজের প্রান্ত অন্য অংশ থেকে বেশি প্রশস্ত, যার ফলে দুইটি কাঁধের উৎপত্তি হয়েছে। সেই কারণে, এগুলোকে 'কাঁধযুক্ত বাটালি' (shouldered adze) নামেও অভিহিত করা হয়। এই বাটালিগুলোর কাজের প্রান্তের প্রস্থচ্ছেদ ত্রিভুজাকৃতি, কিন্তু হাতলের অংশের প্রস্থচ্ছেদ আয়তাকার। অন্যান্য ফলকেও প্রস্থচ্ছেদের বিভিন্নতা বর্তমান; কোথাও আয়তাকার, কোথাও-বা ডিম্বাকার, এবং সেসব ক্ষেত্রে হাতলের প্রান্ত গোলাকার প্রস্থচ্ছেদ বিশিষ্ট।

নব্য প্রস্তর সংস্কৃতিতে খনিত্র ফলকই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার। সম্ভবত প্রাচীন কৃষিকাজ সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে—যেমন, গাছ কাটা, মাটি কোপানো, প্রয়োজনমত কাঠের জিনিষপত্র তৈরি করা প্রভৃতি—খনিত্র ফলকের ব্যাপক ব্যবহার ছিল।

2. ছেনি (Chisel)—এই হাতিয়ার সম্ভবত খনিত্র ফলকেরই উন্নত সংস্করণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলো অপেক্ষাকৃত সরু এবং লম্বা। কাজের প্রান্ত বেশীরভাগ নমুনাতেই খনিত্র ফলকের মত উভয় তল ঢালু, চওড়া ও ধারালো। কোন কোন ক্ষেত্রে স্ক্রু-ড্রাইভারের প্রান্তের মত সূচালো এবং অঙ্কতল-পৃষ্ঠতল বরাবর (dorso-ventrally) চওড়া ও ধারালো প্রান্ত সম্বলিত। হাতিয়ারের অপর প্রান্ত সাধারণত মোটা ও ভোঁতা। এ জাতীয় হাতিয়ার শুধুমাত্র চোকলা তুলে এবং অংশত মসৃণ করে তৈরি করা হত।

কাঠের কাজে ব্যবহারের পক্ষে এই ছেনি-জাতীয় হাতিয়ারের প্রয়োজন অনস্বীকার্য—যেমন আজকের দিনেও। কাজের বিপরীত প্রান্ত হাতুড়ি দ্বারা আঘাতের উপযুক্ত করেই তৈরি করা হত।

3. চাঁচুনি (Scraper)—নব্য প্রস্তর সংস্কৃতিতে প্রায় সব রকমের চাঁচুনি পাওয়া গেছে, তার মধ্যে অধিকাংশই প্রান্ত-চাঁচুনি। মূলপাথর এবং চোকলা—উভয় প্রকার চাঁচুনিরই সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। প্রান্ত-চাঁচুনিগুলোর কাজের প্রান্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিভাবে উত্তল, এবং ছোট ছোট চোকলা তুলে (চাপ পদ্ধতিতে) ধারালো করা। কয়েকটি নমুনাতে মাছের-আঁশের মত ছোট ছোট চোকলা তোলা।



চিত্র 31

অনেক ক্ষেত্রেই চাঁচুনিগুলোকে দণ্ডে লাগিয়ে ব্যবহার করা হত বলে বোঝা যায়। সে যুগে ক্রমবর্দ্ধমান কাঠের কাজের প্রয়োজনেই এইসব চাঁচুনি ব্যবহৃত হত।

4. তীরাগ্র (Arrowhead)—নব্য প্রস্তর সংস্কৃতিতে নানা ধরনের তীরাগ্র পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে কিছু নমুনা অত্যন্ত উন্নত ধরণের। এগুলো মূলত তীক্ষ্ণাগ্র সম্পন্ন ছোট হাতিয়ার। দুই ধার অত্যন্ত ধারালো, তীক্ষ্ণাগ্রের বিপরীত প্রান্ত প্রশস্ত এবং মোটা—আকৃতিতে কখনো সোজা, কখনো অবতল, আবার কখনোবা বর্দ্ধিত-অংশ (tang) সম্পন্ন। বর্দ্ধিত-অংশ যুক্ত তীরাগ্রগুলো দুই পাশে ডানার মত বিস্তৃত, এবং বর্দ্ধিত-অংশ ও ডানার অংশের মধ্যবর্তী খাঁজ চাপ-পদ্ধতির সাহায্যে ছোট ছোট চোকলা তুলে ভোঁতা করা। অধিকাংশ নমুনার উভয় তলও চাপ-পদ্ধতিতে চোকলা তোলা, এবং উভয় তলে অনুদৈর্ঘ্য উঁচু রেখা (mid-ridge) বর্তমান।



চিত্র 32

তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ ছাড়া, অনুপ্রস্থ অগ্রভাগ সম্পন্ন তীক্ষ্ণাগ্রও এই সংস্কৃতিতে বিরল নয়। এগুলোর প্রশস্ত কাজের প্রান্ত উভয় তল থেকে বড় এবং

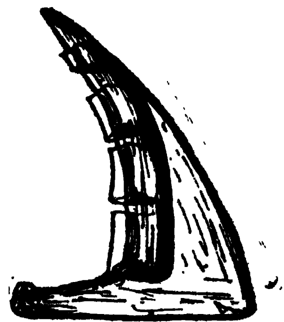
চালু চোকলা অপসারণের মাধ্যমে নির্মিত। অনুপ্রস্থ তীরাগ্রের একটি বিশেষ নমুনার সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে যার কাজের প্রান্ত অত্যন্ত বেশী বিস্তৃত এবং উত্তল, বিপরীত প্রান্ত অনেক সরু এবং দুই পার্শ্বরেখা অবতল। অনুমিত হয়, তীরাগ্র অপেক্ষা চামড়া কাটার চাঁচুনি/ছেনি-রূপেই এই হাতিয়ার অধিকতর উপযোগী ছিল।

5. কাস্তে (Sickle)—দুই ধরনের কাস্তে নব্য প্রস্তর সংস্কৃতিতে দেখা গেছে: মাঝারি আকৃতির হাতিয়ার (লম্বায় প্রায় পাঁচ/ছয় ইঞ্চি), সেগুলো হাতে ধরেই ব্যবহার করা হত। এগুলোর কাজের প্রান্ত প্রায় সোজা ও ছোট ছোট চোকলা অপসারণের মাধ্যমে ধারালো করা, হাতলের প্রান্ত সরু, ভারী ও ভোঁতা, কাজের বিপরীত প্রান্ত উত্তল। ক্রমাগত খড়, ঘাস প্রভৃতি কাটার ফলে কাজের প্রান্ত ও সংলগ্ন এলাকা বিশেষভাবে মসৃণ, যা দেখে এর প্রয়োগ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট ধারণা করা সম্ভব হয়েছে। স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে এর নমুনা আবিষ্কৃত হয়েছে।



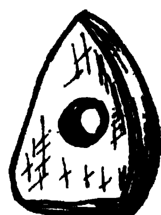
চিত্র 33

অন্য প্রকার যে কাস্তের পরিচয় পাওয়া গেছে সেটাতে ছোট ছোট ধারালো চোকলা পাথর সারিবদ্ধ ভাবে কোন বিশেষ ধরনের হাতলে এমনভাবে লাগানো হত যে একটি অবতল ধারালো কাজের প্রান্ত তৈরি হত। এইসব ছোট চোকলা পাথর-গুলোর কাজের প্রান্ত সূক্ষ্ম খাঁজ কাটা (denticulate)। আফ্রিকার নব্য প্রস্তর সংস্কৃতিতে এই প্রকার কাস্তের নিদর্শন মেলে।



চিত্র 34

6. **হাতুড়ি-কুঠার** (Hammer-Axe)—এগুলো মোটা ও ভারী হাতিয়ার—একপ্রান্ত সরু ও ধারালো এবং অন্য প্রান্ত মোটা, সমতল ও আয়তাকার। মাঝখানে হাতল লাগাবার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত গোল গর্ত বর্তমান। হাতিয়ারগুলোর সমস্ত দেহ ঘসা (ground) বা মসৃণ (polished) করা।



চিত্র 35

দেখেই বোঝা যায়, এই হাতিয়ারের ধারালো প্রান্ত কুঠারের মত কাটার কাজে এবং ভোঁতা ও মোটা প্রান্ত হাতুড়ির মত ব্যবহার করা হত।

7. **কোদাল বা লাঙলের ফলা জাতীয় হাতিয়ার**—শক্ত পাথরে তৈরি এবং উন্নতভাবে মসৃণ করা এই হাতিয়ার আকারে লম্বা এবং বর্গাকার প্রস্থচ্ছেদ বিশিষ্ট, পৃষ্ঠতল উত্তল, অঙ্কতল সমতল, কিন্তু কাজের প্রান্তের কাছে ঢালু,—ফলে কাজের প্রান্ত ধারালো। বিপরীত প্রান্ত আয়তাকার।

হাতিয়ারগুলো দেখে বোঝা যায় যে, মাটি চষার জন্য লাঙলের মত কোন হাতিয়ারের ফলা হিসাবে বা উপযুক্ত বাঁকা কোন দণ্ডে লাগিয়ে কোদাল হিসাবে ব্যবহার করা হত।

8. **আংটি-পাথর** (Ring Stone)—এই ধরনের হাতিয়ার গোলাকার বা বর্তুলাকার যার কেন্দ্রে ছিদ্র বর্তমান। প্রধানত দুই ধরনের আংটি-পাথর পাওয়া গেছে—একটি চ্যাপ্টা ও গোলাকার এবং অপরটি বর্তুলাকার। এই আংটি-পাথরগুলো আগাগোড়া ঘসা। সম্ভবত, বিভিন্ন হাতিয়ারের সঙ্গে এগুলো ওজন হিসাবে ব্যবহৃত হত, যেমন, খনন-দণ্ডের (digging stick) মাথায়, বা মাছ ধরার জালের তলায় বা বয়নশিল্পে।



চিত্র 36

এছাড়া আরও এক প্রকার আংটি-পাথর পাওয়া গেছে যার পরিধি অত্যন্ত ধারালো এবং কেন্দ্রস্থ ছিদ্রের এলাকা সবচেয়ে পুরু।

গোটা হাতিয়ারটি উন্নতভাবে মসৃণ করা। এ জাতীয় আংটিগুলো সম্ভবত গদা/মুগুরের মাথায় (mace head) লাগিয়ে মারনাস্ত্র-রূপে ব্যবহৃত হত।



চিত্র 37

9. ছোরা (Dagger)—সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগ, ধারালো দুই পাশ এবং শক্ত মোটা হাতলের এই হাতিয়ার ধাতু নির্মিত আধুনিক ছোরার পূর্বসূরীরূপে চিনতে কষ্ট হয় না। এগুলোর দেহ থেকে প্রধানত চাপ-পদ্ধতিতে ছোট ছোট চোকলা তোলা। স্ক্যান্‌ডিনেভিয়া ও বেলজিয়াম থেকে এ জাতীয় নিদর্শন পাওয়া গেছে।

10. হারপুন, সূচ, ইত্যাদি—হাড়ের তৈরি সূচ ও ছিদ্রক নব্য প্রস্তর সংস্কৃতির সাধারণ হাতিয়ার। সূচগুলো সরু, লম্বা, এবং পিছনে ছিদ্র-সম্বলিত। হাড়ের তৈরি হারপুন প্রধানত সুইজারল্যাণ্ড থেকে পাওয়া গেছে। অন্যান্য হারপুন হরিণের শিং-এ তৈরি। এগুলো কখনো একসারি কাঁটা যুক্ত, কখনোবা দুসারি। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই পিছনে ছিদ্রযুক্ত। নব্য প্রস্তর যুগের হারপুনের কাঁটাগুলো এমন বিশেষভাবে নির্মিত যে চোখে দেখেই অন্ত পুরাতন প্রস্তর বা মধ্য প্রস্তর সংস্কৃতির হারপুন থেকে পৃথক করে চেনা সম্ভব।



চিত্র 38

□ □ □

প্রাগৈতিহাসিক মানুষ যেসব পাথরের হাতিয়ার নির্মাণ করেছিল এ যুগের বিজ্ঞানীরা সেইসব হাতিয়ার পর্যবেক্ষণ করে, আজও যেসব আদিবাসী পাথরের হাতিয়ার নির্মাণ ও ব্যবহার করে তাদের নির্মাণপদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করে, এবং নিজে হাতে পাথর নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে বিভিন্ন হাতিয়ার নির্মাণের মাধ্যমে পদ্ধতি-গুলো আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন।

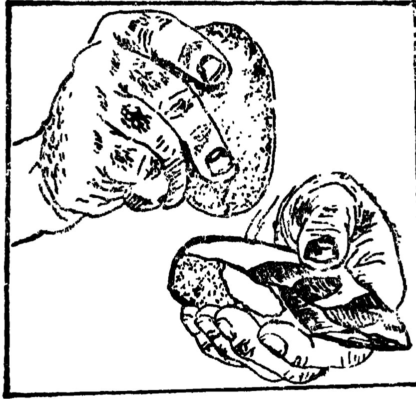
হাতিয়ার নির্মাণের পদ্ধতিগুলোকে প্রধানত তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়: (ক) আঘাত (Percussion)-পদ্ধতি; (খ) চাপ (Pressure)-পদ্ধতি এবং (গ) ঘর্ষণ ও মসৃণ (Grinding and Polishing)-পদ্ধতি। যেসব হাতিয়ার অন্য কোন পদ্ধতিতে তৈরি সেক্ষেত্রেও প্রাথমিক পর্যায়ে আঘাত পদ্ধতি আবশ্যক। বিভিন্ন পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা নীচে বর্ণিত হল:

1. আঘাত-পদ্ধতি—আঘাত-পদ্ধতিকে প্রথমত দু'প্রকারে বিবেচনা করা যেতে পারে যথা, প্রত্যক্ষ আঘাত ও পরোক্ষ আঘাত।

(ক) প্রত্যক্ষ আঘাত পদ্ধতি—এই পদ্ধতিকে আবার কয়েকটি প্রযুক্তিগত পদ্ধতিতে ভাগ করা যায়, যেমন, হাতুড়ি-পাথর (Hammer Stone), নেহাই পাথর (Block-on-Block বা Anvil Stone), গোল দণ্ডাকার হাতুড়ি (Cylinder Hammer) এবং নির্মিত মূল পাথর (Prepared Core)।

(অ) হাতুড়ি-পাথর পদ্ধতি—এই পদ্ধতিতে একটি পাথরের খণ্ডকে অন্য একটি পাথর দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে আঘাতের দ্বারা চোকলা তুলে হাতিয়ার নির্মাণ করা হয়। যে পাথর দিয়ে আঘাত করা হয় (লম্বাটে নুড়ি পাথরই তার জন্য উপযুক্ত) তাকে হাতুড়ি-পাথর বা আঘাতকারী পাথর (Striker Stone) বলে। পরীক্ষায় দেখা

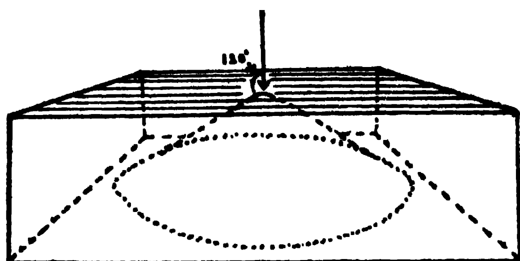
গেছে যে তিন পাউণ্ড মত ওজনের পাথরই এ কাজে সবচেয়ে উপযোগী, তবে ছোট ছোট চোকলা তোলার জন্য দুই বা তিন আউন্স ওজনের পাথরই উপযুক্ত।



চিত্র 39

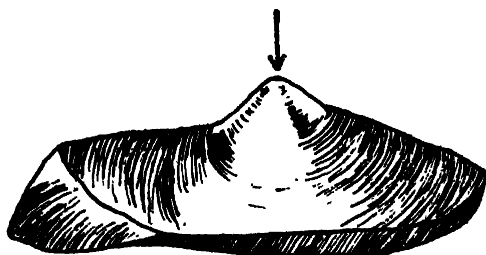
কোন নুড়ি পাথর বা খণ্ড-পাথরকে চোকলা তুলে হাতিয়ারে রূপান্তরিত করতে হলে সেটাকে এক হাতে বা উরুর ওপর রেখে অন্য হাতে হাতুড়ি-পাথরের উত্তল প্রান্ত দিয়ে আঘাত করা হয়। কখনো কখনো জীর্ণ ও পুরানো পরিত্যক্ত কোন হাতিয়ারকে হাতুড়ি পাথরের কাজে লাগানো হয়।

হাতে-কলমে পরীক্ষায় দেখা গেছে যে একটি আয়তাকার পাথরের খণ্ডকে হাতুড়ি-পাথরের উত্তল প্রান্ত দিয়ে আঘাত করলে আঘাত-বিন্দু থেকে পাথরের ভিতর দিয়ে শঙ্কু আকারে ফাটল পড়ে, এবং শঙ্কুর গা-বরাবর পাথরটি ভেঙে যায়—আঘাতের দিক বরাবর ভাঙে না। প্রদত্ত বলের বৃত্তগুলো কি গতিতে পাথরের ভিতর দিয়ে যাবে তা নির্ভর করে পাথরটির ভিতরকার রোধের পরিমাণের ওপর। যার ফলে, উদ্ভূত শঙ্কুর আকৃতি নানা রকম হতে পারে। তবে শঙ্কুর গা এবং আঘাতের দিকের অন্তর্বর্তী কোণ মোটামুটিভাবে 120° থেকে 160° হবে।



চিত্র 40

একটি খণ্ড-পাথর থেকে চোকলা তোলার ক্ষেত্রে পাথরটি কতটা পুরু এবং কি জাতীয় (আকৃতি) চোকলা তোলা হবে তা বিচার করে সঠিক পদ্ধতিতে আঘাত করা প্রয়োজন। এইভাবে আঘাতের ফলে যে চোকলা অপসারিত হয় তার অঙ্কতলে (অর্থাৎ যে তল পাথরটির সংস্পর্শে ছিল) আঘাত-বিন্দুর সংলগ্ন স্থান জুড়ে, অর্দ্ধ-শঙ্কু আকৃতির স্ফীতির (Bulb of percussion) উদ্ভব হয়।

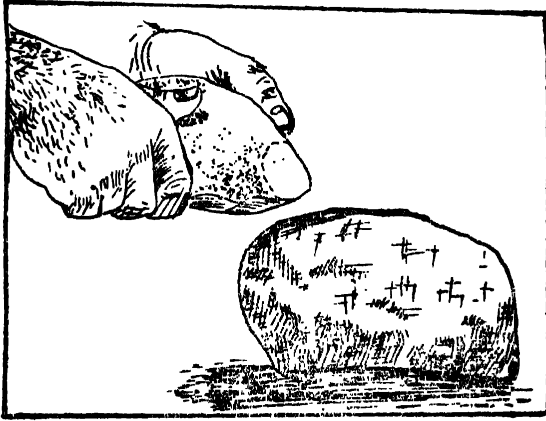


চিত্র 41

অঙ্কতলে স্ফীতিসহ চোকলা অপসারিত হওয়ার ফলে মূল পাথরটির সেস্থানে একটি অবতল ক্ষেত্রের উদ্ভব হয় যাকে ঋণাত্মক স্ফীতি (Negative bulb of percussion) বলে। সহজ ভাষায় একে চোকলা-দাগ বা চোকলা-তল (flake scar)-ও বলে। এই পদ্ধতিতে হাতিয়ার নির্মাণের সময় মূল-পাথরের খণ্ডটিকে মাটি, কাঠ বা গাছের ছালের ওপর বা নির্মাতার উরুর ওপর রেখে আঘাত করা হয়। তাহলে তলদেশ থেকে প্রত্যাঘাতের সম্ভাবনা অনেক

কম থাকে ; উপরন্তু আঘাতের তীব্রতাও কিছু পরিমাণে শোষিত (absorbed বা damped) হয়।

(আ) নেহাই-পাথর পদ্ধতি—এই পদ্ধতিতে, যে পাথরকে হাতিয়ারে রূপান্তরিত করা হবে তাকে অন্য একটি স্থির (stationary) পাথরের চাঙরে আঘাত করা হয়। সঙ্গত কারণেই এই পদ্ধতি দ্বারা নির্দিষ্টভাবে (বা পরিকল্পিতভাবে) কোন চোকলা অপসারণ সম্ভব নয়। বড় একটি পাথরের খণ্ডকে ভেঙে টুকরো করে মোটামুটি কাজের উপযোগী কোন হাতিয়ার তৈরি করা যায় মাত্র।

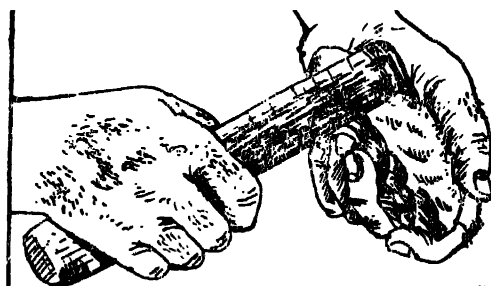


চিত্র 42

আদি পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির গোড়ার দিকে যেসব হাতিয়ার পাওয়া গেছে, বিশেষত চোকলা-হাতিয়ার, তার অনেকগুলোই এই পদ্ধতিতে নির্মিত বলে বোঝা যায়। তবে, আবিভিলিয় শিল্পেও এই পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ছেদনী জাতীয় হাতিয়ার, আদিম ও স্থূল হাত-কুঠার, এবং ক্ল্যাক্টোনিয় চোকলা-হাতিয়ার নির্মাণে এই পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়। পরবর্তী পর্যায়ে এর বিশেষ প্রয়োগ দেখা যায় না।

(ই) গোল দণ্ডাকার হাতুড়ি পদ্ধতি—এই পদ্ধতিতে নরম কোন পদার্থের—যেমন, কাঠ, হাড়, শিং বা ক্ষয়িত (weathered) হাতিয়ার—হাতুড়ি দ্বারা ঠুকে ছোট ও পাতলা চোকলা তোলা হয়। বলা বাহুল্য, হাতুড়ি-পাথর পদ্ধতিতে মোটামুটিভাবে হাতিয়ারের কাঠামো তৈরি করে এই পদ্ধতিদ্বারা তাকে সম্পূর্ণ করা হত। এই পদ্ধতিতে যেহেতু হালকা হাতুড়ি ব্যবহার করা হয় তাই আঘাতের পরিমাণ অনেক ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব—ছোট ও অগভীর চোকলা তোলার ক্ষেত্রে যা একান্তভাবে আবশ্যক। সেইজন্য এই পদ্ধতিকে "নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি"ও (controlled flaking) বলা হয়। প্রসঙ্গত, হাতুড়ি-পাথর ও নেহাই-পাথর পদ্ধতিকে মুক্ত বা অনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি (free flaking) বলা হয়।

এই পদ্ধতিতে চোকলা অপসারণ করতে হলে যে পাথর থেকে চোকলা তোলা হবে সেটাকে হাতের তালুতে রেখে আঙুলগুলো দিয়ে চেপে রাখতে হয়—যে অংশ থেকে চোকলা তোলা হবে সেই অংশ ছেড়ে। বিশেষ হাতুড়ি দিয়ে নির্দিষ্ট অংশের প্রান্তে আঙুলের



চিত্র 43

দৈর্ঘ্য বরাবর আঘাত করা হয়। ফলে, অগভীর চোকলা অপসারিত হয়; হাত ও আঙুলের চাপ আঘাতের বিস্তৃতিকে বাধা দেয় এবং আঘাতের বল কিছুটা প্রশমিত করে। কোন কোন ক্ষেত্রে চোকলা-তল অগভীর না হয়ে গভীর, ছোট ও ধাপের মত হতে দেখা যায়।

যদি আঘাতের বল বাঞ্ছিত পথ অনুসরণ না করে উৎসের দিকেই ফিরে আসে তবেই শুধু এ ধরনের চোকলা-তলের উৎপত্তি ঘটে। এ জাতীয় চোকলা-তলকে "ধাপ চোকলা-তল" (step flaking বা hinge fracture) বলে। আহত পাথরের আভ্যন্তরীন প্রতিরোধের পরিমাণ এবং আঘাতের দিকের (dircetion) উপরই প্রধানত এ জাতীয় চোকলা-তলের উৎপত্তি নির্ভর করে।

গোল দণ্ডাকার হাতুড়ি পদ্ধতি আদি পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির আস্যুলিয় শিল্পেই প্রথম লক্ষ্য করা গেছে। সেই সময় থেকে অন্তত মধ্য পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতি পর্যন্ত এই পদ্ধতির প্রয়োগ সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।

ঈ) নির্মিত-মূলপাথর পদ্ধতি—এই পদ্ধতিতে হাতিয়ার তৈরির আগে মূল পাথরটিকে কেটে ছেঁটে (dressing) প্রস্তুত করে নেওয়া হয় এবং হাতিয়ারটি তৈরি হয় শেষ পর্যায়ে একটিমাত্র আঘাতের দ্বারা—অর্থাৎ বাঞ্ছিত চোকলাটিকে মূল-পাথর থেকে বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইরূপে বিচ্ছিন্ন চোকলাটিই হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হত, আবার কখনো তার ওপর দ্বিতীয় পর্যায়ের (secondary retouch) চোকলা তুলে আরও উপযোগী করা হত। বলা বাহুল্য, এটি চোকলা-হাতিয়ার নির্মাণ পদ্ধতি।

উপরোক্ত পদ্ধতিতে হাতিয়ার তৈরির আগে একটি উপযুক্ত মূল পাথর বা নুড়ি পাথর নির্বাচন করে যে অংশ থেকে হাতিয়ার নির্মাণ করা হবে তাকে চোকলা তুলে তুলে প্রায় সমতল করা হয়। সেই সমতল ক্ষেত্রটির ওপর ভবিষ্যৎ হাতিয়ারগুলোর আকৃতি তৈরি করে নেওরা হয় এবং আঘাত-তলগুলো (striking platform) প্রস্তুত করা হয়। তারপর নির্দিষ্ট বিন্দুতে উল্লম্বভাবে আঘাত করা হয়। ফলে, চোকলা-হাতিয়ারটি নির্মিত মূলপাথর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসে; এবং এটাই এই পদ্ধতিতে হাতিয়ার নির্মাণের

অন্তিম পর্যায়। অনুরূপভাবে, সেই তল থেকে পরিকল্পিত সমস্ত হাতিয়ারগুলো বিচ্ছিন্ন করা হয়।

এইভাবে অপসারিত চোকলা-হাতিয়ারের অঙ্কতলে, আঘাত-তলের নীচে এবং আঘাত বিন্দুকে বেষ্টন করে অর্দ্ধ-শঙ্কু আকৃতি বিশিষ্ট স্ফীতির উদ্ভব হয় এবং প্রধান চোকলা-তল আঘাত-তলের সঙ্গে প্রায় সমকোণে অবস্থিত থাকে।

মূল পাথরের একটি তল থেকে এইভাবে কেন্দ্রাভিসারী চোকলা অপসারণের ফলে সেই তলটি অনেকটা কচ্ছপের খোলার মত দেখায়। অন্যতলে আদি-ত্বক অবিকৃত থাকে। এইসব পরিত্যক্ত মূল পাথর দেখেই লেভালয়সিয় পদ্ধতি চেনা ও বোঝা সম্ভব। তাই এই জাতীয় ফেলে দেওয়া মূলপাথরকে 'কূর্ম-মূল' (tortoise core), এবং সেই অনুযায়ী, যে পদ্ধতিতে চোকলা তোলার ফলে এ ধরনের মূলপাথরের উদ্ভব হয় তাকে 'কূর্ম-মূল পদ্ধতি' (tortoise core technique) বলে।

আদি পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির লেভালয়সিয় শিল্পে এই পদ্ধতির প্রথম প্রয়োগ দেখা যায়, এবং মধ্য পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির মুসতেরিয় শিল্পের পূর্ব পর্যন্ত এই পদ্ধতিই চোকলা-হাতিয়ার তৈরির প্রধান পদ্ধতিরূপে প্রচলিত ছিল। বস্তুতপক্ষে উন্নত চোকলা-হাতিয়ার তৈরিতে এটি একটি অপরিহার্য পদ্ধতি ছিল এবং পরবর্তী সময়ে অন্ত পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির হাতিয়ার নির্মাণের ক্ষেত্রেও প্রাথমিক ভাবে মূলত এই পদ্ধতিই অনুসৃত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, নির্মিত-মূলপাথর পদ্ধতির উদ্ভবের আগেও চোকলা-হাতিয়ারের উপস্থিতি ছিল। প্রথম দিককার চোকলা হাতিয়ার-গুলো পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে সেগুলো নির্মাণে নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়নি। খুব সম্ভবত সেই সব হাতিয়ার মূল-পাথরের হাতিয়ার নির্মাণের পার্শ্ব-ফল। লেভালয়সিয় শিল্পের পূর্ববর্তী সময়ে নির্দিষ্ট শিল্প হিসাবে ক্ল্যাক্টোনিয় শিল্পের অস্তিত্ব

ইউরোপে দেখা যায়। সেই শিল্পের চোকলা-হাতিয়ার পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে সেগুলো নির্মিত-মূলপাথর পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়নি। আঘাত-স্ফীতির অবস্থিতি, আঘাত-তলের প্রকৃতি এবং আঘাত-তল ও প্রধান চোকলা-তলের কৌণিক পরিমাপ, প্রভৃতির সাহায্যে নির্মিত-মূলপাথর পদ্ধতিতে তৈরি হাতিয়ার চেনা যায়।

(খ) **পরোক্ষ আঘাত পদ্ধতি**—যখন কোন হাতিয়ার থেকে চোকলা তোলার জন্য আঘাতকারী বস্তুদ্বারা প্রত্যক্ষভাবে আঘাত না করে অন্য কোন মাধ্যমের সাহায্য নেওয়া হয়, তখন সেই পদ্ধতিকে পরোক্ষ আঘাত পদ্ধতি বলা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সূচালো প্রান্তযুক্ত কোন কাঠ বা হাড়ের দণ্ডকে মাধ্যমের কাজে ব্যবহার করা হয়।

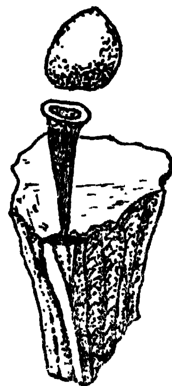
যে পাথরকে এই পদ্ধতিতে হাতিয়ার বানানো হবে তার তলায় গাছের ছাল বা চামড়া দিয়ে বড় কোন পাথরের ওপর রাখা হয়। প্রয়োজনমত দণ্ডটির সূচালো প্রান্ত নির্ণীয়মান পাথরটির নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা হয় এবং অপর প্রান্তে কোন হাতুড়ি-পাথর দিয়ে আঘাত করা হয়। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডটি এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয় যে, পাথরটির গা থেকে ছোট ও অগভীর চোকলা-অপসারিত হয়। এই পদ্ধতিকে "পাঞ্চ" পদ্ধতি (punch techniqe) বলে।

এটা সহজেই অনুমেয় যে, কোন হাতিয়ারকে প্রাথমিকভাবে নির্মাণের পরই কেবলমাত্র পরোক্ষ আঘাত পদ্ধতিদ্বারা তাকে সম্পূর্ণরূপ দেওয়া হত। অন্ত পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির সলুট্রিয় শিল্পের পাতাকৃতি তীক্ষ্ণাগ্রে যে অগভীর ও প্রায় সমান্তরাল চোকলা তলগুলো দেখা যায় সেগুলো সম্ভবত এই পদ্ধতিতেই নির্মিত। এ ছাড়া, খোদক (graver) বা ছেনির (chisel) কাজের প্রান্তে যে বিশেষ ধরনের চোকলা-তল বর্তমান তা-ও এই পদ্ধতিতে নির্মিত বলে মনে করা হয়।

নির্মিত-মূলপাথর পদ্ধতির একটি উন্নততর সংস্করণ অন্ত্য পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির শুরু থেকে দেখতে পাওয়া যায়। এই পদ্ধতির সাহায্যে সরু, লম্বা ও দুই সমান্তরাল পার্শ্ব বিশিষ্ট ব্লেড-চোকলা উৎপন্ন করা হত। তাই এই পদ্ধতিকে 'ব্লেড-চোকলা পদ্ধতি' (blade flake technique) বলে।

ব্লেড-চোকলা পদ্ধতিতে চোকলা অপসারণের জন্য যে মূল পাথর থেকে চোকলা অপসারণ করা হবে প্রথমেই সেটাকে যথাযথভাবে কেটে-ছেঁটে তৈরি করে নেওয়া হয়। বড় কোন পাথরের চাঙর থেকে এমনভাবে মূলপাথরের খণ্ডটিকে আলাদা করা হয় যাতে একটি সমতল ক্ষেত্র পাওয়া যায় যেখান থেকে ব্লেড চোকলাগুলোকে তোলা হবে।

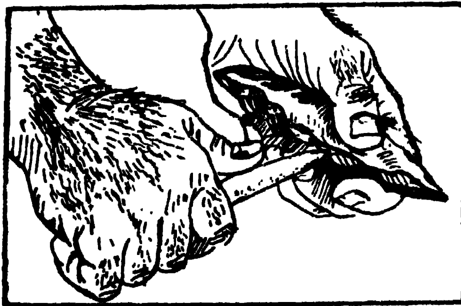
ব্লেড-চোকলা অপসারণের সময় নির্মিত-মূলপাথরটাকে হাঁটুর ওপর তির্যকভাবে ধরা হয়, যাতে আঘাত-তলটি ওপরের দিকে থাকে। এবারে, আঘাত-তলের পরিধির নির্দিষ্ট স্থানে প্রায় 45° কোণে কোন সরু দণ্ডের সাহায্যে আঘাত করা হয়; ফলে, একটি সরু, লম্বা চোকলা, মূল পাথরটির দৈর্ঘ্য বরাবর বিচ্ছিন্ন হয়ে আসে। তারপর, মূল পাথরটিকে নিজের অক্ষের উপর একটু ঘুরিয়ে, অনুরূপভাবে পরবর্তী চোকলাটি অপসারিত করা হয়। এই ভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মূল পাথরটির পরিধি থেকে পর পর চোকলা তোলা হয়। এই পদ্ধতিতে চোকলা তোলার ফলে মূল পাথরটির গায়ে—প্রত্যেকটি চোকলা উঠে যাওয়ার জন্য—লম্বা লম্বা অবতল ক্ষেত্রের উদ্ভব হয়, এবং সেই অবতল ক্ষেত্রগুলির দুই পাশে উঁচু রেখার (ridge) উদ্ভব হয়। দুই পাশে উঁচু রেখা সম্পন্ন এই অবতল ক্ষেত্রগুলি দেখতে অনেকটা লম্বাভাবে চেরা আধখানা বাঁশীর মত হয়; সেই কারণে এই



চিত্র 44

লম্বা অবতল ক্ষেত্রগুলিকে 'ফ্লুটিং' (fluting) বলা হয়। পরে যখন সেই মূল পাথর থেকে আবার ব্লেড-চোকলা তোলা হয়, তখন প্রতিটি উঁচু রেখা বরাবর আঘাত করা হয়। ফলে সেই চোকলা-গুলোর মাঝখানে দৈর্ঘ্য বরাবর উঁচু রেখা দেখা যায়।

2. **চাপ পদ্ধতি**—আদি পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির শেষভাগ থেকেই নির্মিত হাতিয়ারগুলোকে আরও বেশী কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে চোকলা তোলার পরে হাতিয়ারের বিশেষ বিশেষ অংশে (প্রধানত কাজের প্রান্তে) দ্বিতীয় পর্যায়ে (secondary) চোকলা তোলা হয়েছে। হাতকুঠার জাতীয় বড় হাতিয়ারের ক্ষেত্রে কাঠ, শিং, হাড় প্রভৃতির নরম হাতুড়ি দিয়ে সে কাজ করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে যখন চোকলা-হাতিয়ার প্রাধান্য পেল, তখন দ্বিতীয় পর্যায়ে চোকলা তোলার জন্য পূর্বের পদ্ধতি খুব কার্যকর হল না। কারণ, চোকলা হাতিয়ারগুলো সাধারণত ছোট ও পাতলা ছিল। ফলে, বড় হাতুড়ির সাহায্যে সেই সূক্ষ্ম কাজ করা বেশ অসুবিধাজনক হয়েছিল। অন্ত পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতিতে যখন চোকলা-হাতিয়ারই একমাত্র পাথরের হাতিয়ার হিসাবে



চিত্র 45

নির্মিত ও ব্যবহৃত হত, তখন কোন চোকলাকে কার্যকরী হাতিয়ারে পরিণত করা বা ক্ষয়ে যাওয়া হাতিয়ারকে সংস্কার করা প্রভৃতি প্রয়োজনে নতুন পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছিল।

শক্ত কোন তীক্ষ্ণাগ্র দণ্ড দিয়ে চাপের সাহায্যে ছোট ছোট চোকলা তুলে সে সমস্যার সমাধান হয়েছিল। এর ফলে, চোকলাটি ভেঙে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। অন্ত পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির বিভিন্ন ছুরি-ব্লেড-এর ভোঁতা পাশ তৈরি করতে এই পদ্ধতি অত্যন্ত উপযোগী ছিল। এই পদ্ধতির প্রয়োগ নব্য প্রস্তর যুগ পর্যন্ত অব্যাহতরূপে প্রচলিত ছিল। মধ্য প্রস্তর যুগে যে খুদে হাতিয়ার তৈরি করা হত—বিশেষত লুনেট, চাপ-পদ্ধতি সেখানে অপরিহার্য ছিল। সরু, লম্বা, ব্লেড-চোকলাতে চাপ-পদ্ধতির সাহায্যে খাঁজ (notch) কেটে, দুইটি খাঁজের মধ্যবর্তী অংশকে আলাদা করে এই লুনেট জাতীয় খুদে হাতিয়ার তৈরি করা হত। এ ছাড়া, তীরের ফলা, বর্শার ফলা, বিভিন্ন প্রকার চাঁচুনি, প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই চাপ-পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে চাপ-পদ্ধতির সাহায্যে ব্লেড-চোকলাও অপসারণ করা হত। সেটা নির্ভর করে পাথরের প্রকারের ওপর। ফ্লিন্ট জাতীয় পাথর যত



চিত্র 46

সহজে ভঙ্গুর, ভারতের কোয়ার্টজাইট সে তুলনায় অনেক শক্ত এবং মোটা দানা সম্পন্ন। সেক্ষেত্রে, ব্লেড-চোকলা অপসারণের জন্য অনেক বেশী বল প্রয়োগের প্রয়োজন হত। হাতিয়ার নির্মাতা শক্ত তীক্ষ্ণাগ্র-বিশিষ্ট বড় দণ্ডের বিপরীত প্রান্তে লাগানো আড়-ফলকে (transverse piece) বুকের সাহায্যে (বসে বা দাঁড়িয়ে) চাপ দিয়ে ব্লেড-চোকলা অপসারণ করত।

3. ঘর্ষণ ও মসৃণ পদ্ধতি—নব্য প্রস্তর সংস্কৃতিতে হাতিয়ার নির্মাণে এক অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। কুঠার-ফলা, বাটালি, প্রভৃতি হাতিয়ারকে প্রাথমিক ভাবে আঘাত-পদ্ধতিতে নির্মাণের পরে বেলে পাথরের চাঙরে ঘসে মসৃণ করা হত। ফলে, কাজের প্রান্ত অনেক বেশী কার্যকরী হত। প্রথম দিকে এই পদ্ধতির প্রয়োগ হাতিয়ারের সর্বত্র প্রযুক্ত হত না—অংশ বিশেষে হত। বাকী অংশে চোকলা তোলার দাগ বজায় থাকত। পরবর্তী পর্যায়ে অনেক ক্ষেত্রেই গোটা হাতিয়ারকে ঘসা হত কিন্তু সেগুলো তত মসৃণ করা হত না। কিন্তু অন্তিম পর্যায়ের হাতিয়ারগুলো অত্যন্ত সুন্দরভাবে মসৃণ করা হত। এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে নব্য প্রস্তর সংস্কৃতির এই সব হাতিয়ার নির্মাণে অত্যন্ত কঠিন আগ্নেয়শিলা ব্যবহার করা হত, এবং মসৃণ করার ফলে সেগুলো প্রায় ধাতু নির্মিত হাতিয়ারের মত কার্যকরী হয়ে উঠত।

নব্য প্রস্তর সংস্কৃতির বিভিন্ন হাতিয়ারে ছোট/বড় ও বিভিন্ন ধরনের ছিদ্র দেখা যায়। সেগুলো কি ভাবে করা হত সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না, কারণ কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তবে, অনুমান করা হয় যে শক্ত পাথরের গুঁড়ো দিয়ে ছিদ্রের জায়গায় হস্তচালিত সাধারণ ছিদ্রক বা ধনু ছিদ্রকের (Bow-drill) সাহায্যে ছিদ্রগুলো করা হত। খোদক জাতীয় পাথরকে ছিদ্রকের কাজের প্রান্তে লাগানো সম্ভব।

প্রস্তর হাতিয়ার নির্মাণ পদ্ধতিগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা ওপরে

করা হল। অন্ত পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতিতে হরিণের শিং, হাড় ও কাঠের হাতিয়ার তৈরি করতে যে সব হাতিয়ার ব্যবহার করা হত তাদের মধ্যে খোদক, চাঁচুনি (বিশেষত অবতল চাঁচুনি) এবং গরু-মোষ-ঘোড়া প্রভৃতি জন্তুর বড় হাড়ের ভাঙ্গা টুকরো, উল্লেখযোগ্য। হাতিয়ার নির্মাণের জন্য নির্বাচিত শিং বা কাঠের টুকরো থেকে অংশবিশেষ কেটে ফেলার জন্য খোদকের সাহায্যে সমান্তরাল রেখা টানা হত। পরে সেই রেখা দুইটির মধ্যবর্তী অংশকে খোদকের সাহায্যেই ঠুকে ঠুকে কেটে ফেলা হত। এই পদ্ধতিতে হারপুনের কাঁটা নির্মিত হত। কোন হাতিয়ারকে কেটে ছেঁটে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার জন্য চাঁচুনি জাতীয় হাতিয়ার খুবই উপযোগী ছিল। বিভিন্ন অপ্রস্তর হাতিয়ারে ছিদ্র করার জন্য খোদকের অগ্রভাগ সম্বলিত ছিদ্রকের ব্যবহার সহজেই অনুমেয়। আসলে, অন্ত পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতিতে খোদক একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হাতিয়াররূপে উদ্ভাবিত হয়েছিল। সে যুগের চারু-শিল্পেও এই হাতিয়ারের ছাপ সুস্পষ্ট ও ব্যাপক।

মানুষকে হাতিয়ার নির্মাণকারী প্রাণী হিসাবে সংজ্ঞাবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু হাতিয়ার নির্মাণের ব্যাপারটা তো 'দৈবক্রমে' মানুষের ক্ষেত্রে গজিয়ে ওঠেনি, বা সহজাত প্রবৃত্তির মত জন্মসূত্রেও মানুষ এটা পায়নি। এ সম্বন্ধে আগে আলোচনা করা হয়েছে। তাই, এটা যুক্তিগ্রাহ্য যে মানুষের দৈহিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষত তার মস্তিষ্কের বিবর্তন ও উন্নতির সঙ্গে হাতিয়ার নির্মাণ কৌশল ও পদ্ধতির একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকবে। হাতিয়ারের প্রাচীনতম নিদর্শন থেকে শুরু করে যদি বিভিন্ন হাতিয়ার প্রকার, হাতিয়ার নির্মাণ পদ্ধতি ও মানব বিবর্তনের কাঠামোটা বিবেচনা করা যায় তবে এই সম্পর্ক আরও স্পষ্ট বোঝা যায়।

গোড়ার দিকে প্রাচীন মানব অধিকাংশ প্রাকৃতিক বস্তুকে সার্থকতার সঙ্গে ব্যবহার করেছে মাত্র—পরিকল্পনা অনুসারে কোন হাতিয়ার নির্মাণ করতে পারেনি। তার পরবর্তী সময়ে মাঝে মাঝে কিছু হাতিহার তৈরি করেছে বটে, তবে তার অধিকাংশই আকস্মিকভাবে ভেঙে যাওয়া। এর পরে বেশ কিছু হাতিয়ার নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক নির্মিত হয়েছে, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট হাতিয়ার প্রকার বিশেষিত (specialised) হয়নি। এই পর্যায়ের পরে মানুষ নিয়মিতভাবে বিশেষিত হাতিয়ার নির্মাণ করেছে। এবং সবশেষে দেখা যাচ্ছে, মানুষ বিভিন্ন যৌগিক হাতিয়ার নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে, এবং নানা রকম যান্ত্রিক প্রযুক্তি কৌশলে সেই সব হাতিয়ারকে আরও কার্যকরী করে তুলেছে।

যে স্তরে মানুষ নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক হাতিয়ার নির্মাণে সক্ষম হয়েছে, দৈহিক বিবর্তনে তখন মানব গণ—হোমো-র (Genus Homo) উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়। বিশেষিত হাতিয়ার নির্মাণের সঙ্গে আধুনিক মানুষের প্রজাতি—হোমো স্যাপিয়েনস (Homo *sapiens*) সম্পর্কিত। আর, আধুনিক মানুষের (Homo *sapiens sapiens*) আবির্ভাবের সঙ্গে যৌগ হাতিয়ার ও যান্ত্রিক প্রযুক্তি জ্ঞানের সম্পর্ক সুস্পষ্ট। আরও একটা কথা, বিবর্তন যত মানুষের দিকে অগ্রসর হয়েছে, হাতিয়ার সাধারণভাবে তত ছোট হয়েছে।



5. প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য

পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতিঃ প্লিস্টোসিন যুগ ব্যাপী পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে যেসব প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলোকে পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। হাতিয়ার প্রকার, প্রাচীনত্ব, আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য এবং জীবনযাত্রার পদ্ধতির ভিত্তিতে পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতিকে আবার তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়ঃ আদি পুরাতন প্রস্তর, মধ্য পুরাতন প্রস্তর, এবং অন্ত পুরাতন প্রস্তর। যেহেতু, পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতি ও প্লিস্টোসিন যুগ সমসাময়িক তাই, পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে প্লিস্টোসিনের বিভিন্ন বিভাগের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে। সেই অনুসারে, নিম্ন ও মধ্য প্লিস্টোসিন সময় অর্থাৎ প্লিস্টোসিনের শুরু থেকে তৃতীয় হিমবাহ কাল (রিস) পর্যন্ত, আদি পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতি; উচ্চ প্লিস্টোসিনের প্রথমার্দ্ধে, অর্থাৎ রিস-উর্‌ম্ আন্তহিমবাহ কাল ব্যাপী, মধ্য পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতি; এবং উচ্চ প্লিস্টোসিনের শেষাংশে অর্থাৎ উর্‌ম্ হিমবাহ কালে অন্ত পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতি বিরাজিত ছিল [সারণি 2. 2]।

আদি পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতি—আদি পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির প্রাচীনতম নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে—অস্ট্রালোপিথেকাস জাতীয় প্রাচীন মানবের সংস্কৃতি চিহ্নরূপে। সেই হাতিয়ারগুলো মূলত নুড়ি পাথরে নির্মিত ছেদনী জাতীয়। পূর্ব-আফ্রিকার ওল্ডুভাই থেকে এজাতীয় নিদর্শন প্রথম আবিষ্কৃত হয় বলে একে ওল্ডুভাই সংস্কৃতি (Oldowan culture) নামে অভিহিত করা হয়। এইসব হাতিয়ারের অধিকাংশই নিম্ন-প্লিস্টোসিন সময়ের বলে প্রমাণিত হয়েছে। শুরু থেকে প্রথম আন্ত-হিমবাহ কাল পর্যন্ত এই নুড়ি পাথরের সংস্কৃতি বিরজিত ছিল।

সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদির ভিত্তিতে সেই সময়ের প্রাচীন মানবের জীবন যাপন সম্বন্ধে জানা সম্ভব হয়েছে যে তারা প্রধানত সংগ্রহের মাধ্যমেই জীবিকা নির্বাহ করত। সেই সঙ্গে অনুন্নত হাতিয়ারের সাহায্যে এবং অপটুভাবে কিছু কিছু শিকারও করত। তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলো টিকটিকি-গিরগিটি-খরগোস-শজারু প্রভৃতি ছোট প্রাণী। বেবুন জাতীয় বড় প্রাণীর মাংসও তারা খেয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে, তবে মনে হয়, সেগুলো কোন মাংসাশী প্রাণীর ভুক্তাবশিষ্ট। সে সময়ের মানুষ ছোট ছোট দলে (দশ/পনেরো জন) যাযাবরের মত খাদ্যের উৎসের পিছনে ঘুরে বেড়াত। দৈহিক বিচারে তারা তখনও পুরোপুরি মনুষ্য পদবাচ্য হয়ে ওঠেনি ; তবে, অনেকটাই খাড়া হয়ে দু-পায়ে চলা ফেরা করতে পারত।

এই সংস্কৃতির প্রমাণাদি থেকে যে তথ্য সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য-রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় তা হল, প্রাইমেট গোষ্ঠীর (লেমুর, লরিস, বানর, এপ, প্রভৃতি প্রাণীর যে গোষ্ঠী) নিরামিষ খাদ্য তালিকায় এই প্রথম নিয়মিতভাবে মাংসাহারের দৃষ্টান্ত। এই মাংসাহারের অভ্যাস প্রাচীন মানব গোষ্ঠীকে শিকারে প্রণোদিত করেছিল এবং তার ফলে, কার্য-কারণ সম্পর্কে মানুষের দৈহিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন ত্বরান্বিত এবং মানবিক হয়ে উঠেছিল।

পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ মধ্য প্লিস্টোসিন (দ্বিতীয় হিমবাহ থেকে তৃতীয় হিমবাহ কাল পর্যন্ত) সময়ের আদি পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতিতে হাতিয়ার প্রকারে প্রধানত দুইটি ধারা (tradition) লক্ষ্য করা যায়ঃ একটি মূলপাথরের ধারা, অপরটি চোকলা-পাথরের। পশ্চিম ইউরোপে প্রাপ্ত প্রমাণাদির ভিত্তিতে মূলপাথরের ধারায় দুইটি শিল্প (industry)—আবিভিলিয় ও আস্যুলিয় ; এবং চোকলা-পাথরের ধারায় দুইটি শিল্প—ক্ল্যাক্টোনিয় ও লেভালয়সিয়, বর্তমান ছিল বলে জানা যায়। বিশেষ বিশেষ শিল্পের হাতিয়ার যেসব স্থান থেকে প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছে, সেই সব স্থানের নামানু-

সারে এই শিল্পগুলোর নামকরণ করা হয়েছে। [যেমন, ফ্রান্সের আবিভিলি থেকে আবিভিলিয়, সেইণ্ট আস্যুল থেকে আস্যুলিয়, ইংলণ্ডের ক্ল্যাক্টন-অন্-সী থেকে ক্ল্যাক্টোনিয়. ফ্রান্সের লেভালয়েস থেকে লেভালয়সিয়, ইত্যাদি]।

মূলপাথরের হাতিয়ারগুলো প্রধানত হাতকুঠার জাতীয় এবং চোকলা-পাথরের হাতিয়ারগুলো প্রধানত চাঁচুনি জাতীয়। গোড়ার দিকে মূলপাথরের হাতিয়ার নির্মাণের পার্শ্বফল হিসাবেই চোকলা পাথরের হাতিয়ারের উৎপত্তি হয়েছিল বলে বোঝা যায়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তা একটি স্বতন্ত্র শিল্প রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। আবিভিলিয় থেকে আস্যুলিয় এবং ক্ল্যাক্টোনিয় থেকে লেভালয়সিয় শিল্পে ক্রমউৎকর্ষতা পরিলক্ষিত হয়। আবিভিলিয় শিল্পের হাত কুঠারগুলো অনেকটা স্থূলভাবে নির্মিত, চোকলা-তলগুলো বড় এবং গভীর, অনেক ক্ষেত্রেই পাথরের আদিত্বক বর্তমান। আস্যুলিয় শিল্পের হাত কুঠারগুলো সে তুলনায় অনেক সুন্দরভাবে নির্মিত —অধিকাংশই ডিম্বাকার, ছোট এবং অগভীর চোকলা-তল বিশিষ্ট। আফ্রিকা ও ভারতে এই সময়ে কর্তরী (cleaver)-জাতীয় হাতিয়ারও হাতকুঠারের সঙ্গে পাওয়া গেছে—ইউরোপে যা সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত।

দুইটি হিমবাহ এবং দীর্ঘতম আন্তহিমবাহ-কাল ব্যাপী আদি পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির এইসব শিল্প হোমো ইরেক্টাস জাতীয় প্রাচীন মানবের কীর্তি। এই ধরনের মানব-জীবাশ্ম এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে।

হোমো ইরেকটাস (Homo *erectus*) মানব যে নিয়মিতভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে শিকার করত তা মোটামুটিভাবে প্রতিষ্ঠিত। তারা হরিণ, ঘোড়া প্রভৃতি মাঝারি আকৃতির প্রাণী শিকার করত বলে জানা গেছে। ক্ল্যাক্টনে পাওয়া কাঠের (Ewe-কাঠ) বর্শা এবং অবতল চাঁচুনি থেকে বোঝা যায় যে সেই সংস্কৃতিতে কাঠের

অস্ত্রের ওপর বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। সাধারণভাবে ছোট এবং মাঝারি প্রাণী শিকার করলেও সুযোগমত সে সময়ের মানুষ হাতি-গণ্ডারের মত বড় প্রাণীও শিকার করত। সম্ভবত, সংঘবদ্ধ শিকার এবং উন্নত শিকার কৌশল এধরনের মাঝারি ও বড় প্রাণী শিকার সম্ভব করেছিল। সমসাময়িক কালের ভারত থেকেও সেযুগের অনেক হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে; তবে প্রত্যক্ষ জীবাশ্ম প্রমাণ বা বাসস্থানের কোন প্রমাণ না পাওয়ায় তাদের জীবনধারা সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানা যায়নি।

আদি পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির মানুষ যে নিয়মিতভাবে আগুন ব্যবহার করেছে, চীনদেশের শো-কো-তিয়েন (Chou Kou Tien) এবং হাঙ্গেরীর ভার্তেজোলোস (Vertesszollos) থেকে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে। আগুনের নিয়মিত ব্যবহার অবশ্যই আদিম মানুষের জীবন ও সংস্কৃতিতে অভূতপূর্ব পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ এবং হিমবাহ কালের শৈত্যের প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষা করা এবং কাঁচা মাংস ঝলসে খাওয়া, আগুনের ব্যবহারের ফলেই সম্ভব হয়েছিল।

হোমো ইরেকটাস মানবের জটিল সাংস্কৃতিক নিদর্শন থেকে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে তারা ভাবের আদান প্রদানের উপায় হিসাবে সামান্য হলেও কথা বলতে পারত; এবং সংস্কৃতিগতভাবে অনেকটা উন্নত হওয়ার ফলেই সম্ভবত তারা ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে বসবাসের ক্ষমতা অর্জন করেছিল।

দৈহিক বিচারে হোমো ইরেকটাস মানুষ আধুনিক মানুষের তুলনায় অনেকটা অনুন্নত হলেও একই গণ-ভুক্ত ছিল। তারা খাড়া দু-পেয়ে ভঙ্গীতে দাঁড়াতে ও চলাফেরা করতে পারত; এবং মস্তিষ্কের আয়তনের দিক থেকে আধুনিক মানুষের কাছাকাছি।

মধ্য পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতি—এই পর্যায়ের পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির নিদর্শনসমূহ তৃতীয় আন্তহিমবাহ-কাল থেকে চতুর্থ ও শেষ

হিমবাহকালের প্রথম ভাগের স্তর থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। অর্থাৎ এই সংস্কৃতি উচ্চ প্লিস্টোসিনের সমসাময়িক। আদি পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির শেষভাগে যেসব শিল্পের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছিল এ সময়ে সেগুলোরই উন্নত পর্যায়ের নজির মেলে। পশ্চিম ইউরোপে আস্যুলিয় ও লেভালয়সিয় শিল্পের উন্নত পর্যায়, এবং মিশ্র-শিল্প হিসাবে তায়াকিয় (Tayac স্থান নামানুসারে) ও মিকিয় (La Micoque-এর নামানুসারে) এই সংস্কৃতিতে বিরাজিত ছিল। নতুন শিল্পরূপে এই সংস্কৃতিতে মুসতেরিয় (ফ্রান্সের Le Moustier-এর নামানুসারে) শিল্পের আবির্ভাব ঘটেছিল। এই সংস্কৃতির হাতিয়ারগুলো আদি পর্যায়ের হাতিয়ারের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট এবং মূলপাথরের তুলনায় চোকলা-হাতিয়ারের সংখ্যা বেশী। অবশ্য, অনেক হাতকুঠারও এই সংস্কৃতিতে পাওয়া গেছে (ত্রিভুজাকৃতি, বাঁশপাতাকৃতি, হৃদপিণ্ডাকৃতি, প্রভৃতি) তবে, সেগুলো আদি পর্যায়ের হাতকুঠারের তুলনায় পাতলা, ক্ষুদ্রাকৃতি এবং অনেক বেশী ধারালো ও সূচালো। মনে হয়, এবং সেটাই যুক্তি সঙ্গত, যে এইসব হাতকুঠার উপযুক্ত দণ্ডে লাগিয়ে বর্শা হিসাবে ব্যবহৃত হত। হাতকুঠার ছাড়া এই সংস্কৃতির আর সব হাতিয়ার প্রধানত চোকলা-হাতিয়ার। সেগুলোর মধ্যে ত্রিকোণাকৃতি তীক্ষ্ণাগ্র এবং বিভিন্ন প্রকার চাঁচুনি উল্লেখযোগ্য।

মধ্য পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির প্রথমভাগে সংশ্লিষ্ট কোন মানব-জীবাশ্ম পাওয়া যায় নি। তবে, হাতিয়ার প্রকারের ধারাবাহিকতা থেকে অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে এই সংস্কৃতিও হোমো ইরেকটাস জাতীয় মানুষেরই কীর্তি। এই সংস্কৃতির শেষভাগে যে মুসতেরিয় শিল্পের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে মানব জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে তার নাম নিয়ানডারথাল মানব (Homo *sapiens neanderthalensis*)। নাম থেকেই বোঝা যায় এই ধরনের মানুষ বর্তমান মানুষের একই গণ ও প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত।

নিয়ানডারথাল মানুষের সাংস্কৃতিক নিদর্শন বিচার করলে দেখা যায়, জীবিকার্জনের পদ্ধতিতে হোমো ইরেকটাস মানুষের তুলনায় মৌলিক কোন পরিবর্তন না ঘটলেও হাতিয়ার প্রকার ও প্রযুক্তি কৌশলে বেশ কিছু উন্নতি ঘটেছিল। মূলত, ত্রিকোণাকৃতি তীক্ষ্ণাগ্র এবং পার্শ্ব-চাঁচুনিই ছিল তাদের প্রধান হাতিয়ার। তীক্ষ্ণাগ্রগুলোর আকৃতি ও গঠন-প্রকৃতি থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে সেগুলো বর্শার ফলারূপে ব্যবহৃত হত। আর শিকার-প্রাণী কাটা, চামড়া ছাড়ানো, প্রভৃতি আনুষঙ্গিক কাজে উন্নত পার্শ্ব-চাঁচুনি অত্যন্ত উপযোগী হাতিয়ার ছিল।

হোমো ইরেকটাস মানবের সংস্কৃতির শেষভাগে যে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন, যৌথ শিকার, দলগত সংহতি, প্রভৃতি ব্যাপারগুলোর সূত্রপাত ঘটেছিল, জীবিকার্জনে এবং বাঁচার সংগ্রামে সেগুলো ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। তাই, এইসব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দৈহিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলির ওপর নির্বাচন-চাপ (selection pressure) অধিকতর ক্রিয়াশীল হয়েছিল। নিয়ান-ডারথাল মানুষের ক্ষেত্রেও সঙ্গত কারণেই সেইসব বৈশিষ্ট্যের অধিকতর উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

গুহাকন্দর এবং পর্বতাশ্রয় থেকে নিয়ানডারথাল মানুষের যেসব নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে তারা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে আগুন ব্যবহার করেছে। তারা বাসগৃহ নির্মাণ করতে পারত কিনা তা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। তবে, উন্মুক্ত এবং সমতল স্থান থেকে যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকে আন্দাজ করা সম্ভব যে তারা অন্তত নগণ্য কুটির নির্মাণে অপারগ ছিল না।

নিয়ানডারথাল মানুষের সংস্কৃতির অপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য মৃতদেহের সৎকার। কোন কোন নিয়ানডারথাল জীবাশ্ম দেখে বোঝা যায় যে সেগুলো একটি বিশেষ রীতি অনুসারে কবরস্থ করা

হয়েছিল। ইতিপূর্বে এজাতীয় প্রথার কোন নজির পাওয়া যায় নি। এই কবর দেওয়ার প্রথা নিঃসন্দেহেই নিয়ানডারথাল মানুষের কিছু কিছু গুণাবলীর পরিচয় বহন করে। এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত করা সম্ভব যে তারা দেহাতীত অস্তিত্বের সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু ধারণা পোষণ করত। অর্থাৎ তাদের জীবনে সামান্য হলেও ঐন্দ্রজালিক-ধর্মীয় চেতনার অস্তিত্ব ছিল।

অন্ত্য পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতি—প্লিস্টোসিনের শেষাংশে, শেষ (উর্‌ম্) হিমবাহ কালে অন্ত্য পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটে। এই হিমবাহ কাল নিরবচ্ছিন্ন ছিল না—মধ্যবর্তী দুইটি ছোট আন্ত-হিমবাহ কালের দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল। তবে, আবহাওয়া প্রধানত শীতল ছিল।

পশ্চিম ইউরোপের অন্ত্য পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতিতে চারটি শিল্পের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়ঃ পেরিগর্ডিয় (Perigord-এর নামানুসারে), অরিগন্যাকিয় (Aurignac-এর নামানুসারে), সলুত্রিয় (Solutre-এর নামানুসারে) এবং ম্যাগডালেনিয় (La Madelein-এর নামানুসারে)। হাতিয়ার প্রকার ও জীবিকার্জনে সামান্য কিছু পার্থক্য এই শিল্পগুলোর মধ্যে থাকলেও সামগ্রিকভাবে এগুলোর মধ্যে একটা সাদৃশ্য বর্তমান। এবং একই প্রাকৃতিক প্রতিবেশে তাদের উদ্ভব।

মধ্য পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতিতে যে চোকলা-পাথরের হাতিয়ারের প্রাধান্য সূচীত হয়, এ সময় তার পূর্ণ বিকাশ পরিলক্ষিত হয়—এবং হাতকুঠার জাতীয় হাতিয়ার পুরোপুরি বাতিল হয়। তবে, প্রকৃতিগত ও নির্মাণ পদ্ধতিগত দিক থেকে এই সংস্কৃতির হাতিয়ারগুলো মধ্য পুরাতন প্রস্তর হাতিয়ার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। প্রধান হাতিয়ারগুলোর মধ্যে ব্লেড-চোকলায় নির্মিত বিভিন্ন ধরনের ছুরি, মূলপাথর বা চোকলা-পাথরে নির্মিত বিভিন্ন প্রকারের চাঁচুনি, ছিদ্রক, এবং খোদক সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। পাথরের

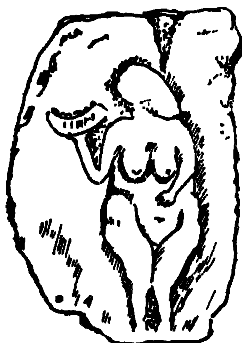
হাতিয়ার ছাড়া এই সংস্কৃতিতে প্রচুর পরিমাণে হাড় ও শিং-এর হাতিয়ার নির্মিত হয়েছে। এই সব হাতিয়ারের মধ্যে বর্শা ফলক, হারপুন, শাসন দণ্ড, বর্শা-ক্ষেপনী, সূচ, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। যন্ত্রপাতি দেখলেই বোঝা যায় যে প্রধানত পশু ও মৎস্য শিকারই এই সংস্কৃতির মানুষের প্রধান উপজীবিকা ছিল।

প্রচুর পরিমাণে পশু শিকার এবং হাড় ও শিং-এর তৈরি সূচ ও ছিদ্রক থেকে এ কথা মনে করা যায় যে এই সংস্কৃতির মানুষ পশু-চামড়াকে পোষাক ও তাঁবু তৈরির কাজে ব্যবহার করত। আবার অন্ত পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতিতে অনেক সছিদ্র শামুক ও ঝিনুকের খোলা পাওয়া গেছে। এইসব শামুক ও ঝিনুকের খোলা যে মালার মত গেঁথে অঙ্গ সজ্জায় অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করা হত, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

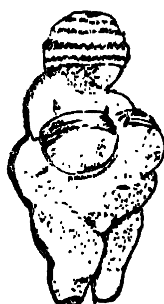
অন্ত পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেসব মানব-জীবাশ্ম পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই কবরস্থ অবস্থায়। এ থেকে নিঃসন্দেহেই বোঝা যায় যে কবরের মাধ্যমে মৃতদেহের সৎকার করা সেযুগেই একটা প্রচলিত রীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শুধু কবর দেওয়াই নয়, মৃতদেহের সঙ্গে নানা রকম ব্যবহার্য জিনিস-পত্রও কবরে সাজিয়ে দেওয়া হত; এবং মৃতদেহকে মেটে সিঁদুর জাতীয় রঙে রঞ্জিত করা হত। কবর দেওরার এত বিশদ ব্যবস্থা থেকে স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় যে সেই সংস্কৃতির মানুষের মরনোত্তর কোন জীবন বা অতিপ্রাকৃত (supernatural) সম্বন্ধে কোন-না-কোন ধারণা ছিল।

চারু শিল্প : অন্ত পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতিতেই সর্বপ্রথম চারু শিল্পের সাক্ষাৎ মেলে। এই সংস্কৃতির শুরুতে এর আবির্ভাব এবং শেষ পর্যায়ে অবক্ষয়িত। সেযুগের মানুষের বাসস্থান এবং অনধ্যুষিত ও দুরধিগম্য গুহাভ্যন্তর থেকে খোদাই, ভাস্কর্য, মডেলিং-রিলিফ এবং রঙের মাধ্যমে সৃষ্ট নানা শিল্পকর্মের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে।

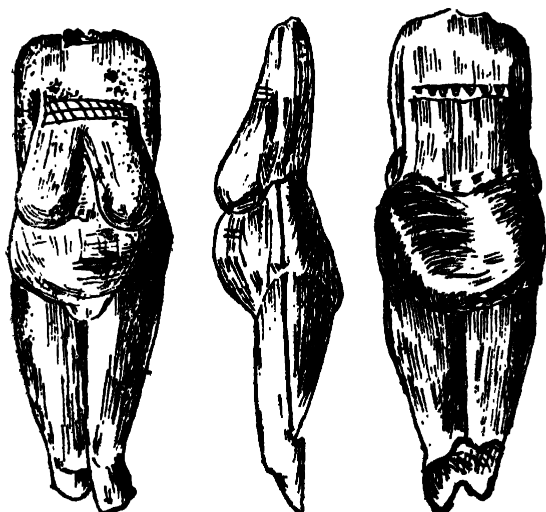
এখানে উল্লেখ্য, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকেই প্রাগৈতিহাসিক চারু শিল্পের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু, পশ্চিম ইউরোপে, বিশেষত ফ্রান্স ও স্পেনে, যে চারুশিল্পের সাক্ষাৎ মেলে, তা সম্ভবত প্রাচীনতম এবং সর্বোৎকৃষ্ট।



চিত্র 47



চিত্র 48

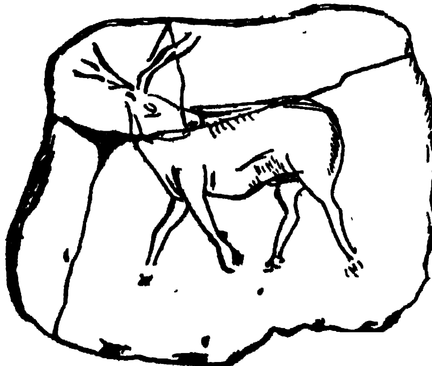


চিত্র 49



চিত্র 50

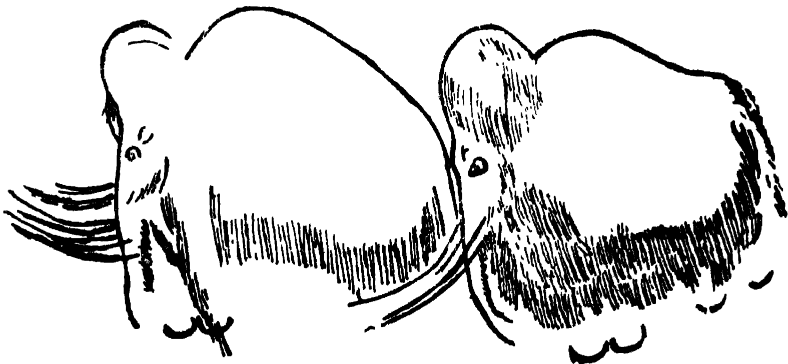
বাসস্থান (home site) থেকে যেসব শিল্পবস্তু পাওয়া গেছে সেগুলো অধিকাংশই ছোটখাটো বস্তু এবং স্থানান্তর যোগ্য। এগুলো সাধারণত খোদাই, ভাস্কর্য বা রিলিফ পদ্ধতিতে করা হয়েছে। সেই সঙ্গে হাড় ও শিং-এর বিভিন্ন হাতিয়ারের ওপরও এই শিল্প প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এইসব শিল্পবস্তুর মধ্যে "নারী মূর্তি" ("venus"), শাসন দণ্ড, বর্শাক্ষেপনী, এবং একক বা দলবদ্ধ প্রাণীর রূপায়ণ উল্লেখযোগ্য। উদাহরণ হিসাবে কয়েকটি নিদর্শন [চিত্র 47-51] দেখানো হল। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বাসস্থান থেকে আবিষ্কৃত স্থানান্তর যোগ্য শিল্প-সামগ্রীকে সামগ্রিকভাবে গৃহ-শিল্প (Home Art) নামে অভিহিত করা হয়।



চিত্র 51

দক্ষিণ পশ্চিম ফ্রান্স ও উত্তর স্পেনের প্রায় একশ'টি গুহা থেকে কয়েক হাজার চারুশিল্পের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে— যা রূপায়িত হয়েছে প্রায় তেইশ হাজার বছর ধরে। যেসব গুহাকন্দর এই চারুশিল্পের চরম উৎকর্ষের সাক্ষী হয়ে আছে সেগুলোর অধিকাংশই বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি, এবং বাসস্থান থেকে অনেকটা দূরে, দুরধিগম্য স্থানে অবস্থিত। গুহাভ্যন্তরের এইসব শিল্পকর্ম প্রধানত গুহাব দেওয়ালে ও ছাদে খোদাই ও রং-এর মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে। গৃহ-শিল্প থেকে এই চিত্রসম্ভারকে আলাদা করে বোঝার জন্য একে গুহা-শিল্প (Cave Art) বলা হয়।

ফ্রান্স ও স্পেনের যেসব গুহা থেকে গুহা-শিল্পের ভালো ভালো নিদর্শন পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে ফ্রান্সের তেইজাৎ, লাসকো, নিয়ো, ট্রইস ফ্রেরিস, পেয়ার-নন্-পেয়ার, লগেরী ব্যাসে, লগেরী হাউতে, লসেল, লা মুথ, ইস্তরিজ, ফন্ত-দ্য-গমে, লাবাতুত, ব্রাসেম্পাওই ; এবং স্পেনের পার্পাল্লো, আলতামিরা উল্লেখযোগ্য। এইসব গুহার অধিকাংশতেই মনুষ্য বসতির কোন প্রমাণ নেই। এবং বাসস্থান থেকে সেগুলো বেশ কিছুটা দূরে অবস্থিত। অনেকক্ষেত্রে গুহাভ্যন্তরের প্রবেশ পথ অত্যন্ত সংকীর্ণ, অন্ধকার ও স্যাঁতসেঁতে।



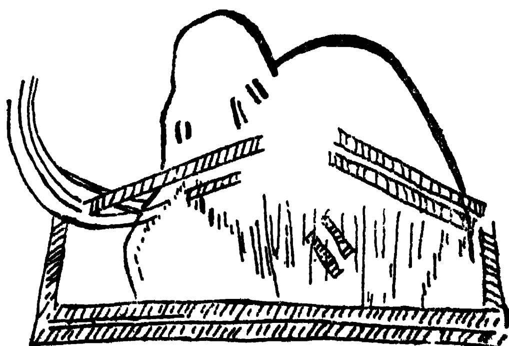
চিত্র 52



চিত্র 53



চিত্র 54



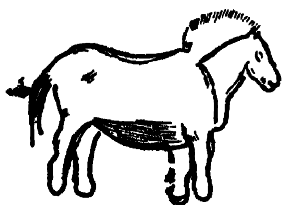
চিত্র 55

অথচ এইসব গুহাভ্যন্তরের দেওয়ালে, ছাদে, এবং বিশেষ করে আনাচে-কানাচে, ফাটলে, রচিত হয়েছে এক অবিশ্বাস্য শিল্পকর্ম। এইসব গুহার দেওয়ালের সমস্ত জায়গা জুড়েই যে আঁকা হয়েছে এমন নয়—কোন কোন অংশকে সে যুগের শিল্পীরা যেন বেশী পছন্দ করেছে, এবং একই জায়গায় একাধিকবার এঁকেছে। বিশেষ করে, গোপন স্থানগুলোর ওপর বেশী পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

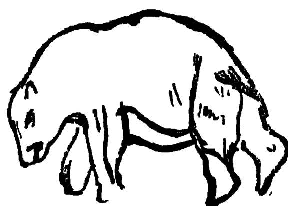
সমগ্র চিত্র সম্ভারের প্রধান বিষয়বস্তু সেযুগের জন্তু-জানোয়ার—বিশেষত যেসব প্রাণী শিকার করে সে সময়ের মানুষ জীবন ধারণ করত। যেমন, বাইসন, ঘোড়া, বল্গা হরিণ, ভালুক, বুনো শূয়োর, গণ্ডার, হাতি, ইবেক্স, প্রভৃতি। এইসব প্রাণীকে চিত্রিতও করা হয়েছে বেশির ভাগ শিকারের পটভূমিকায়। কোথাও বর্শা-বিদ্ধ, যন্ত্রণাকাতর বাইসন (চিত্র 54), কোথাওবা ক্ষিপ্ত ও তেড়ে আসা ভঙ্গী (চিত্র 53)। আবার কোথাও শিকারীর দল তাড়া করেছে হরিণ বা হাতির দলকে। এরকম নানা দৃশ্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে সে যুগের প্রাণীকুল। আরও একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, অনেক প্রাণীকেই দেখানো হয়েছে অন্তঃস্বত্বা অবস্থায়। অন্যদিকে, গৃহশিল্পে যে "নারী-মূর্তি"গুলো পাওয়া গেছে তার প্রায় সবগুলোই অন্তঃস্বত্বা বা প্রজনন সংক্রান্ত স্থানগুলো প্রকটভাবে প্রদর্শিত।

সমগ্র চারুশিল্পে মানুষের বিশদ চিত্রণ অতি সামান্য এবং নিসর্গ দৃশ্য সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। মানুষের চিত্রণ হয়েছে কখনো শিকার দৃশ্যের অনুষঙ্গ হিসাবে, কখনোবা প্রজনন তথা উর্বরতার প্রতীক হিসাবে। মানুষের বেশ কিছু হাতের ছাপ পাওয়া গেছে—প্রত্যক্ষভাবে রঙে রঞ্জিত করে, বা পরোক্ষভাবে, হাতের অংশ ফাঁকা রেখে বাকি অংশ রঞ্জিত করে। অনেকক্ষেত্রেই এইসব হাতের ছাপকে কিছু পরিমাণে বিকৃত করে দেখানো হয়েছে।

এসব ছাড়া, গুহা-শিল্পে এমন কিছু অঙ্কন বা চিহ্ন পাওয়া গেছে



চিত্র 56

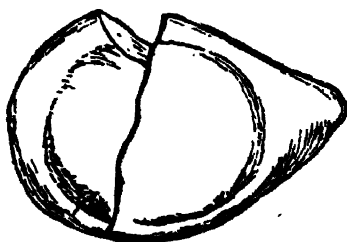


চিত্র 57





চিত্র 58



চিত্র 59



চিত্র 60

যেগুলো দুর্বোধ্য। সেইসঙ্গে, গৃহ-শিল্পে পাওয়া নানা ধরনের শাসনদণ্ডের ব্যবহারও ঠিকমত বোঝা যায় না।

গুহা-শিল্পের চিত্রগুলো রং এবং খোদাইয়ের মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে। চিত্রগুলো পর্যবেক্ষণ করলে সেগুলোর ক্রমোন্নতি বুঝতে পারা যায়। গোড়ার দিকের কাজগুলোর মধ্যে দুর্বল খোদাই এবং একরঙা দ্বিমাত্রিক চিত্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী পর্যায়ে অত্যন্ত শক্তিশালী রেখা (খোদাই বা রং) এবং বহুবর্ণের ব্যবহারে ত্রিমাত্রিক চিত্রেরও অনেক নিদর্শন মেলে।

খোদাই চিত্রগুলো নিঃসন্দেহেই পাথরের খোদকের সাহায্যে করা হয়েছিল। ওই সময়ের সংস্কৃতিতে হাতিয়ার হিসাবে বিভিন্ন প্রকার খোদকের প্রাধান্য এবং কোন কোন খোদাই চিত্রের সঙ্গে খোদকের উপস্থিতি এ অনুমান সমর্থন করে। আর, রঙীন চিত্রগুলোতে ব্রাশ বা তুলির ব্যবহার স্পষ্ট। তুলির কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া গেলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, যেসব লোমশ প্রাণী তারা শিকার করত তাদের লোম, কাঠ বা হাড় বা হরিণের শিং-এর দণ্ডে লাগিয়ে তুলি বানানো হত।

রঙিন চিত্রগুলোর মধ্যে লাল, হলুদ এবং কালো রঙের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। নীল, সবুজ ও সাদা রঙের ব্যবহার সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কালো রং তৈরি করা হত জন্তুর হাড় পুড়িয়ে গুঁড়ো করে। আকরিক ম্যাঙ্গানীজ অক্সাইড-এর গুঁড়ো দিয়েও নীলচে কালো রং তারা ব্যবহার করেছে। লোহার বিভিন্ন আকরিক থেকে সেযুগের শিল্পীরা পেয়েছিল চকোলেট থেকে হাল্কা লাল, আর কমলা থেকে হলুদ রং। এইসব রংকে জন্তুর চর্বির সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করা হয়েছে। তার ফলে সেইসব রং পাথরের মতই স্থায়ী হয়েছিল।

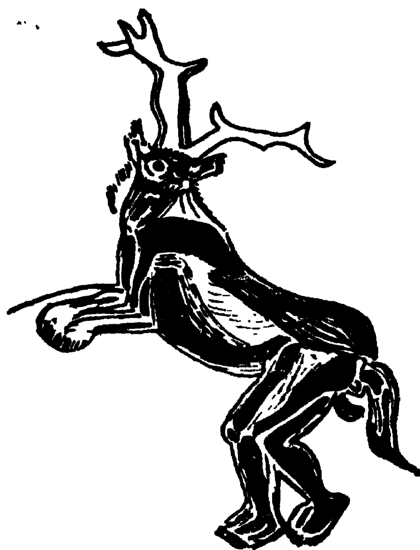
গুহাভ্যন্তরগুলো অধিকাংশই অত্যন্ত অন্ধকার—দিনের আলো সেখানে প্রবেশ করে না। কিন্তু সম্পূর্ণ অন্ধকারে এই অসাধারণ

শিল্পসৃষ্টি সম্ভব নয়। তাই, সঙ্গতভাবেই আলোর ব্যবস্থার কথা মনে আসে। কয়েকটি গুহায় (লা মুথ, লগেরা হাউতে, প্রভৃতি) পাথরের প্রদীপ পাওয়া গেছে (চিত্র 59), যা থেকে নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে শিল্পসৃষ্টির সময় গুহাকে প্রদীপের আলোয় আলোকিত করা হত।

অন্ত পুরাতন প্রস্তর যুগের মানুষ (বিশেষত পশ্চিম ইউরোপের) যে শিল্প-রুচি ও দক্ষতার বিচারে যথেষ্ট উন্নত ছিল তা তাদের সাংস্কৃতিক বস্তুসামগ্রী দেখলেই বোঝা যায়। বিভিন্ন হাতিয়ার নির্মাণের ক্ষেত্রেও তাদের শিল্প-কুশলতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কি কারণে তারা তাদের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম দুরধিগম্য গুহাভ্যন্তরে নিষ্পন্ন করেছিল—বিশেষত যেখানে তারা বাস করেনি—তা স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তোলে।

সমগ্র শিল্পকর্ম বিশ্লেষণ করে পণ্ডিতরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে ওই চারুশিল্প মূলত সেযুগের মানুষের জাদু-বিশ্বাসের ফলশ্রুতি। সাধারণত যেসব কারণে কোন শিল্প সৃষ্টি করা হয়, যেমন, নিছক সৌন্দর্য সৃষ্টি বা শিল্পী-সত্তার প্রতিফলন, এসব কোন কারণই সেযুগের শিল্পকর্মকে (বিশেষ করে গুহা-শিল্প) যথেষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে না। কারণ, সে-ক্ষেত্রে দুরধিগম্য গুহাভ্যন্তরে শিল্প সৃষ্টি না করে, বাসস্থান বা তার কাছাকাছি করা হত; এবং কেবলমাত্র শিকার-প্রাণী ও শিকার-দৃশ্য না এঁকে নিসর্গ দৃশ্য ও মানুষের পোর্ট্রেট আঁকাই ছিল স্বাভাবিক।

আজকের দিনে বিভিন্ন আদিবাসী সমাজে এবং প্রাগ্রসর সমাজেও জাদু বিশ্বাস এবং আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকে জানা যায় যে জাদু বিশ্বাস মূলত দু'রকমের —অনুকরণমূলক (Homoeopathic) ও সংশ্রবমূলক (Contagious)। অনুকরণমূলক জাদুর মূল বিশ্বাস হল, কোন কিছুকে পেতে হলে তার সার্থক অনুকরণ করা ; এবং তার উপর জাদু ক্রিয়া



চিত্র 61



চিত্র 62

আরোপ করা। আজকের দিনে যে কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয় তা-ও অনুকরণমূলক জাদু বিশ্বাস প্রণোদিত।

প্লিস্টোসিনের শেষ পর্যায়ে পশ্চিম ইউরোপের হিমবাহ-কবলিত প্রেক্ষাপটে মানুষের জীবন সংগ্রাম অত্যন্ত তীব্র রূপ ধারণ করেছিল, অনুমান করা যায়। সে সময়ের মানুষ যে মূলত পশু-শিকারের মাধ্যমেই জীবনধারণ করত তা প্রতিষ্ঠিত সত্য। সেই পটভূমিতে খাদ্যের উৎস ও যোগান বৃদ্ধি করার জন্য অনুকরণমূলক জাদুর আশ্রয় নেওয়া অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। এই জাদু বিশ্বাসের মূলে যে আত্মা বা অতিপ্রাকৃতিক শক্তির ধারণা প্রয়োজন তা-ও সেযুগের মানুষের ছিল—মৃতের সৎকার এবং প্রথাগত কবর দেওয়ার রীতি থেকে তা বোঝা যায়।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে চিত্রিত গুহাগুলিকে আজকের দিনের দেব-স্থানের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এবং সেই কারণেই সেগুলো বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি। সেই একই যুক্তিতে চিত্রগুলো সম্পর্কে সাধারণ গোপনীয়তা এবং নানা রকমের দুর্বোধ্য চিহ্নেরও তাৎপর্য বোঝা সম্ভব।

অন্ত্য পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির এই শিল্পকর্মকে তাই জীবন সংগ্রামের একটি আবশ্যিক হাতিয়াররূপে গণ্য করা হয়। এর মাধ্যমে একাগ্রতা, নিষ্ঠা, মনোবল ও দলগত সংহতিকে বৃদ্ধি করা সম্ভব হত। এছাড়া, কোন সার্থক শিকারের বর্ণনামূলক অভিনয় এবং আগামী শিকার অভিযানের আগে গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রশিক্ষণও এই চারুশিল্পের পিছনে ক্রিয়াশীল থাকা সম্ভব।

ম্যাগডালেনিয় সংস্কৃতির শেষভাগেই এই চারুশিল্পের উৎকর্ষতা অনেকটা অবক্ষয়িত হয়ে পড়ে। এই আপাত অবক্ষয় প্রকৃতপক্ষে রচনা শৈলীর পরিবর্তন—শিল্পীর অক্ষমতা নয়। তখন কোন প্রাণীকে তার যথাযথ অ্যানাটমিতে না এঁকে বিভিন্ন ব্যঞ্জনার আশ্রয় নেওয়া হয় এবং বক্তব্যকে ঘনীভূত করে স্বল্প রেখায় প্রকাশ করার

প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এই ধারা বেয়েই সম্ভবত পরবর্তীকালে প্রাচীন লিপির উদ্ভব ঘটে।

মধ্য প্রস্তর সংস্কৃতি ঃ প্লিস্টোসিনের শেষে তুষার যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে। ফলে, পৃথিবীপৃষ্ঠের ভূপ্রাকৃতিক অবস্থার নানা পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়। মহাদেশগুলো অনেকটা আজকের চেহারা নেয়। মানুষের সমাজও এই পরিবর্তিত প্রতিবেশে নতুনভাবে অভিযোজনের প্রয়াস পায়। জলবায়ু, গাছপালা, এবং স্থলভূমি ও সমুদ্রের বিন্যাস, সবই অতি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছে ; এবং বিভিন্ন স্থানের ভৌগলিক অবস্থান অনুযায়ী কমবেশী হারে সংঘটিত হয়েছে।

আবহাওয়ার এই পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর সর্বত্র সমুদ্রের জল বেড়েছেঁ,—ফলে সমুদ্র-পৃষ্ঠ উঁচু হয়েছে। কারণ, ইতিপূর্বে যে জলরাশি বরফের আকারে মেরু অঞ্চলে এবং উঁচু পর্বত চূড়ায় আবদ্ধ ছিল, সেগুলো জলে পরিণত হয়ে নদী ও সমুদ্রের কলেবর বৃদ্ধি করেছিল। হিমবাহ গলে জল হয়ে একদিকে যেমন সমুদ্রের জল-বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ভূ-খণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, অন্যদিকে তেমনই হিমবাহ-কবলিত অঞ্চল বরফের ভারমুক্ত হয়ে উন্নত হয়ে ওঠে।

উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতেও স্বাভাবিকভাবেই আবহাওয়ার এই পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছিল। ইউরোপের নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে পূর্বের স্তেপ ও তুন্দ্রাঞ্চলে জঙ্গলের আবির্ভাব হয়েছিল। আবার, দক্ষিণাঞ্চলে শুষ্ক আবহাওয়ার জন্য আগের অরণ্য অপসারিত হয়ে রুক্ষ আবহাওয়া ও মরুভূমির উৎপত্তি হয়েছিল। আর, নীল, টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস, সিন্ধু, ইয়েলো প্রভৃতি নদীতে বার্ষিক প্লাবনের ফলে প্রায়-মরুভূমি অঞ্চলে গাছপালা জন্মানোর মত জমির সৃষ্টি হয়েছিল। অন্যদিকে, প্লিস্টোসিনের লোমশ হাতি, লোমশ গণ্ডার, প্রভৃতি শীতল আবহাওয়ায় অভিযোজিত প্রাণী অবলুপ্ত হয় ; এবং বল্গা হরিণ পশ্চিম ইউরোপ থেকে ক্রমশ মেরু অঞ্চলের দিকে

সরে যেতে থাকে। জলা জায়গা বেড়ে যাওয়ায় মানুষ তার খাদ্য তালিকায় বেশী পরিমাণে মাছ, শামুক, ঝিনুক প্রভৃতি সংযোজন করতে থাকে।

পরিপার্শ্বের এই সব নতুন নতুন পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানোর জন্য মানুষ প্রথমেই যা-যা করেছিল সেগুলোকে একত্রিতভাবে মধ্য প্রস্তর সংস্কৃতি নামে অভিহিত করা হয়। অর্থ-নীতির বিচারে এই সংস্কৃতি পূর্ববর্তী অন্ত পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতি থেকে পৃথক ছিল না—জীবিকা সংগ্রহের মূল উপায় তখনও সেই সংগ্রহ-ও-শিকারই বজায় ছিল। তবে, পশু শিকারের তুলনায় বিভিন্ন প্রকার ফল-মূল, শামুক-ঝিনুক, মধু, মাছ প্রভৃতি সংগ্রহের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল। ফলে, যেসব জায়গায় সারা বছর খাদ্যবস্তু সংগ্রহের বেশী সুযোগ ছিল, সেখানে মানুষ অনেকটা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিল।

হাতিয়ারের দিক থেকে এই সময়ে দুইটি ভিন্ন ধারার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্রথমত, অন্ত পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির শেষে যে ধরনের ছোট-ছোট হাতিয়ার নির্মাণের রীতি প্রচলিত হয়েছিল, তারই পথ ধরে নির্মিত হয়েছে ফ্লিন্ট, জ্যাসপার ক্যালসেডনি, অ্যাগেট প্রভৃতি পাথরের অতি ক্ষুদ্র হাতিয়ার সামগ্রী (microliths)। এইসব খুদে হাতিয়ারের অনেকগুলিই জ্যামিতিক আকৃতির যেমন, ত্রিভুজ, ট্রাপিজ, লুনেট, প্রভৃতি। সেইসঙ্গে আছে অ-জ্যামিতিক কিছু চাঁচুনি, তীরাগ্র ও খোদক। এইসব খুদে হাতিয়ারের অধিকাংশই সম্ভবত, উপযুক্ত দণ্ডে লাগিয়ে হারপুন, ছুরি, করাত, তীর প্রভৃতি যৌগ-হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হত। দ্বিতীয় ধারার হাতিয়ারের মধ্যে মাটি খোঁড়া ও গাছ কাটার উপযোগী গাঁইতি ও কুঠার উল্লেখযোগ্য। গাঁইতি সাধারণত বড় ও ভারী পাথরকে মোটামুটিভাবে চোকলা তুলে একটি প্রান্ত সুচালো করে তৈরি করা হত। আর, কুঠার তৈরি হত প্রশস্ত কাজের-প্রান্ত বিশিষ্ট

পাথরের হাতিয়ারকে উপযুক্ত কাঠের বা শিং-এর দণ্ডে লাগিয়ে। এসব ছাড়া, এই সংস্কৃতিতে হাড় ও শিং-এর হাতিয়ার এবং বিভিন্ন শামুক ও ঝিনুকের খোলাও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। এই সংস্কৃতির শেষের দিকে মানুষ স্থূল মৃৎপাত্র তৈরি শুরু করেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই সময়ে ইউরোপের কিছু কিছু "বসতি" থেকে কুকুরের হাড় আবিষ্কৃত হয়েছে—যদিও সে কুকুর তখনও অনেকটা নেকড়ে বা শেয়ালের মত। তবে, মনে হয়, আজকের কুকুরের পূর্বপুরুষরা সেই সময় থেকেই মানুষের সংস্পর্শে এসে গিয়েছিল, এবং অনতিকাল পরেই মানুষের পোষ মেনে গৃহপালিত হয়েছিল।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, প্লিস্টোসিনোত্তর সময়ের পরিবর্তিত প্রতিবেশে নতুনভাবে অভিযোজনের জন্য মানুষের জীবিকার্জনে ও জীবনযাত্রায় প্রক্রিয়াগত এবং প্রযুক্তিগত কিছু কিছু পরিবর্তনের সূত্রপাত এই মধ্য প্রস্তর সংস্কৃতিতে ঘটেছে বা ঘটতে শুরু করেছে।

নব্য প্রস্তর সংস্কৃতি ঃ মধ্য প্রস্তর সংস্কৃতির শেষে পৃথিবী পৃষ্ঠের আবহাওয়া যখন তুষার যুগের অস্বাভাবিক অবস্থা কাটিয়ে বর্তমানের আবহাওয়ায় স্থিতিলাভ করেছে, সেই সময়ে মানুষের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটে। মধ্য-প্রাচ্যে খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় সাত হাজার বছর আগে থেকে এই সংস্কৃতির আবির্ভাব লক্ষ্য করা গেছে। পৃথিবীর অন্যত্র বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে এই সংস্কৃতির সূত্রপাত ঘটেছে,—সর্বত্র একই সময়ে ঘটেনি।

নব্য প্রস্তর সংস্কৃতিতেই মানুষ সর্বপ্রথম খাদ্যের ব্যাপারে অনেকখানি প্রকৃতি-নির্ভরতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিল—পশুপালন ও চাষ-বাসের মাধ্যমে। তাই এই সংস্কৃতিকে খাদ্যোৎপাদন অর্থনীতির প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। মধ্য প্রস্তর সংস্কৃতিতে যে পশুপালনের সূত্রপাত দেখা গিয়েছিল, এই

সংস্কৃতিতে তা আরও বিকশিত হয় এবং কুকুরের পরে পর্যায়ক্রমে ছাগল, ভেড়া, শূকর, গবাদি পশু, ঘোড়া, উট, হরিণ প্রভৃতি প্রাণীকে মানুষ গৃহপালিত করতে সক্ষম হয়। জারমো এবং জেরিকো থেকে গৃহপালিত ছাগলের সর্বপ্রথম নিদর্শন পাওয়া যায়। গৃহপালিত গবাদি পশু লম্বা শিং-বিশিষ্ট ছিল এবং সেগুলো Bos *primigenius*, Bos *namadicus* এবং Bos *indicus*-এর বংশধর।

অন্যদিকে উদ্ভিদ জগতে মানুষ সর্বপ্রথম যবকে চাষের আওতায় আনতে সক্ষম হয়। তারপরে গম ও ধানকে চাষের অন্তর্ভুক্ত করে। কৃষিজ গম এবং যবের প্রাচীনতম প্রমাণ প্যালেষ্টাইন থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাচীন গমের যে নিদর্শন পাওয়া গেছে সেগুলো Triticum জাতীয়; এর তিনটি প্রকার ছিল, diploid, tetraploid এবং hexaploid। যবের মধ্যে দুইটি প্রকারের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে—দুই সারি বিশিষ্ট (two rowed) এবং ছয় সারি বিশিষ্ট (six rowed)। ধান সম্ভবত ভারতে সর্বপ্রথম চাষের আওতায় আসে, খ্রীঃ পূঃ 3000 অব্দে; তারপর চীনদেশ থেকেও ধান চাষের প্রমাণ মেলে। ইংলণ্ড এবং সোভিয়েত রিপাব্লিক থেকে জোয়ার চাষের প্রথম প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে।

কৃষি কাজের মূল ব্যাপারটা মানুষের আয়ত্তাধীন হওয়ার পর থেকে একে একে বিভিন্ন শস্য, ফল ও সব্জি প্রভৃতিকে সহজেই চাষের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এই খাদ্যোৎপাদন অর্থনীতির সূত্রপাতের ফলে মানবসমাজে কতকগুলো অভিনব পরিবর্তনের সূচনা হয়। প্রথমত, কৃষি ও পশুপালনের মাধ্যমে জীবিকার্জনের জন্য কৃষিযোগ্য জমি ও চারণভূমির সঙ্গে মানুষ নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে, এবং মোটামুটি স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। ফলে, ঘরবাড়ি নির্মাণ ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে কারিগরি দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বিভিন্ন পরিবারের একই স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাসের ফলে

মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম গ্রামীণ সমাজের উদ্ভব ঘটে। দ্বিতীয়ত, কৃষি কাজে প্রয়োজনীয় হাতিয়ারের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। গাছ কাটা, জমি চষা, প্রভৃতি কাজের জন্য প্রচুর পরিমাণে কুঠার ও কোদালের ফলা নির্মিত হয়। এইসব পাথরের হাতিয়ারকে প্রাথমিকভাবে তৈরি করার পর ঘসে মসৃণ করা হত। এ জাতীয় হাতিয়ার নির্মাণে যে বিশেষ ধরনের শক্ত আগ্নেয়শিলার প্রয়োজন হত তা সর্বত্র পাওয়া যায় না; ফলে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে সেই পাথর বা নির্মিত হাতিয়ার অন্যত্র রপ্তানী হত।

কুঠার, কোদাল ও অন্যান্য হাতিয়ারের হাতল ও ঘরবাড়ি তৈরিতে কাঠের ব্যবহারের জন্য কাঠ কাটার বিভিন্ন প্রকার ছেনি, হাতুড়ি, বাটালি প্রভৃতি হাতিয়ারও সে সময়ে নির্মিত হয়েছে; এবং কাঠের কাজ একটি পৃথক শিল্পরূপে আবির্ভূত হয়েছে। পশুপালন এবং কৃষিকার্যের সূত্রপাত ঘটলেও নব্য প্রস্তর সংস্কৃতিতে সংগ্রহ-ও-শিকার অর্থনীতিও পাশাপাশি প্রচলিত থেকে গেছে; এবং সেইজন্য বিভিন্ন প্রকার তীরাগ্র, হারপুন, বড়ষি, প্রভৃতি হাতিয়ারও নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতিতে সমধিক প্রচলিত ছিল।

নব্য প্রস্তর সংস্কৃতির মিশ্র-চাষ অর্থনীতির ফলস্বরূপ বিভিন্ন শিল্পের (craft) আবির্ভাব ও প্রসার ঘটে; যেমন, মৃৎ-শিল্প, ঝুড়ি-ধামা প্রভৃতি নির্মাণ বিষয়ক শিল্প, দারুশিল্প, বয়নশিল্প, ইত্যাদি।

চাষের মাধ্যমে শস্য উৎপাদনের অবশ্য অনুষঙ্গরূপে সেই শস্য সঞ্চয়ের জন্য ঝুড়ি, ধামা, মৃৎপাত্র প্রভৃতি আধারের প্রয়োজন, এবং অন্যদিকে শস্যকে খাদ্যে পরিণত করার জন্য পেষাই যন্ত্র (যাঁতা) এবং রান্না করার জন্য বিভিন্ন পাত্রের প্রয়োজনে মৃৎ-শিল্প এবং ঝুড়ি-ধামা প্রভৃতি নির্মাণ বিষয়ক শিল্পের উৎপত্তি ও দ্রুত প্রসার ঘটে। জেরিকো এবং জারমো থেকে যে প্রাচীনতম মৃৎপাত্রের নজির পাওয়া গেছে তার ওপর অনেকক্ষেত্রেই চাটাই বা মাদুর জাতীয় বস্তুর ছাপ লক্ষ্য করা গেছে। ফলে, অনুমান করা অসঙ্গত নয়

যে মৃৎ-পাত্র নির্মাণের আগেই মানুষ ঝুড়ি-ধামা-মাদুর প্রভৃতি নির্মাণে পারদর্শিতা অর্জন করেছিল। গোড়ার দিকে হাতে তৈরি মৃৎপাত্র শুধুমাত্র সূর্যের তাপে শুকিয়ে শক্ত করা হত; পরবর্তী সময়ে আগুনে পোড়ানো হত। মাটিকে আগুনে পোড়ালে যে রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হওয়ার ফলে তা কঠিন বস্তুতে রূপান্তরিত হয়, তা না জানলেও, ছোট-খাটো আকস্মিক ঘটনা থেকে এ সত্য আবিষ্কারে খুব বেশী বিলম্ব ঘটেনি যে আগুনে পুড়িয়ে মাটিকে অনেক বেশী শক্ত ও স্থায়ী আকৃতি দেওয়া সম্ভব। ফলে, মৃৎপাত্রের উদ্ভাবনের অল্প পরেই আগুনে পোড়া মৃৎপাত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই সামান্য একটি আবিষ্কারও নব্য প্রস্তর সংস্কৃতিতে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং পরবর্তী অনেক উদ্ভাবনকে সহজ করেছিল। অন্ত্য পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতি থেকেই পশু-চামড়া ব্যবহারের যে ব্যাপক প্রচলন দেখতে পাওয়া গেছে তা থেকে একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে প্রাচীনতম পাত্রগুলোর মধ্যে চামড়ার তৈরি পাত্রই সর্ব প্রথম; এবং তারই অনুকরণে প্রথম দিকে বিভিন্ন ঘাস, বল্কল প্রভৃতির সাহায্যে থলি নির্মিত হয়। পরবর্তী সময়ে তার অনুকরণে মৃৎপাত্র নির্মাণ করা হয়। পাত্রের ব্যাপক চাহিদাই নিঃসন্দেহে মৃৎপাত্র নির্মাণে প্রেরণা জুগিয়েছিল। নব্য প্রস্তর সংস্কৃতির শেষদিকে চাকা আবিষ্কারের ফলে মৃৎপাত্র নির্মাণে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছিল। আজও সেই কুমোরের চাকা নব্য প্রস্তর সংস্কৃতির জীবন্ত ফসিল হয়ে বজায় রয়েছে।

সমাজে বিভিন্ন সামগ্রীর নিয়মিত চাহিদা পূরণের প্রয়োজনে বিভিন্ন ব্যক্তি বা পরিবার বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত থাকতে শুরু করে— ফলে, শ্রমের সামাজিক বণ্টনের সূত্রপাত ঘটে; এবং অনতিবিলম্বেই বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর শ্রমের সমন্বয়ে স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রামীন সমাজের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে।

এই সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোয় শ্রমের বিনিময়ে ভোগ্যপণ্য বন্টনের সূত্রপাতের ফলে ক্রমে বণ্টন ব্যবস্থায় জটিলতা বৃদ্ধি পায় এবং বাণিজ্যের সূত্রপাত ঘটে। বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন পণ্য ও হাতিয়ার আমদানী এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপন্নের রপ্তানী মারফৎ এই বাণিজ্য ক্রমশ প্রসার লাভ করে। এই বাণিজ্যিক প্রয়োজনেই প্রধানত মানুষের বিভিন্ন সমাজের মধ্যে চিন্তা ও কারিগরি/প্রযুক্তি জ্ঞানের আদান প্রদান শুরু হয়। যোগাযোগ ও যাতয়াতের জন্য মানুষ পায়ে হাঁটা ছাড়া শ্লেজ জাতীয় প্রাচীন শকট ব্যবহার করেছে, এবং জল পথে ভেলা-ডোঙা-নৌকা প্রভৃতি ব্যবহার করেছে।

নব্য প্রস্তর সংস্কৃতির এই সার্বিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই পারিবারিক কাঠামো ও সদস্য সংখ্যা, পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের দায়িত্ব-কর্তব্য, সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়েও জটিলতা বৃদ্ধি পায়। পুরাতন প্রস্তর এবং মধ্য প্রস্তর সংস্কৃতিতে মানুষ সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল বলে এবং সেই কারণে খানিকটা যাযাবর জীবন যাপন করত বলে পরিবারের (স্বামী-স্ত্রী-পুত্রকন্যা) তুলনায় বিভিন্ন ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত গোষ্ঠীর গুরুত্ব বেশী ছিল। শিকার ও সংগ্রহের প্রয়োজনে পুরুষদের অধিকাংশ সময়েই বাইরে থাকতে হত। অন্যদিকে, শিশু প্রতিপালনের প্রয়োজনে স্ত্রী-দের বেশীর ভাগ সময় বাসস্থানে আবদ্ধ থাকতে হত। এই সমস্ত কারণে গোষ্ঠীর আভ্যন্তরীন কাঠামোয় পুরুষের তুলনায় স্ত্রীর প্রাধান্য বেশী ছিল,—সন্তানের কাছে পিতা অজ্ঞাত থাকলেও মাতার পরিচয় অস্পষ্ট ছিলনা। ফলে, গোষ্ঠী-জীবনে মাতৃ-প্রাধান্য বিরাজিত ছিল। সংগ্রহ ও শিকার অর্থনীতিতে খাদ্যের ব্যাপারে অনিশ্চিয়তা, প্রতিপদক্ষেপে বিপদের সম্ভাবনা, প্রভৃতি স্বাভাবিক কারণে ...ীর আকৃতি সাধারণত ছোট ছিল। শিশু-মৃত্যুর হার এবং

প্রজনন-হারও সম্ভবত সেই অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। বর্তমান কালের অনুরূপ গোষ্ঠীকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, সেই সব সমাজে সাধারণভাবেই প্রজনন-হার কম। এটা নির্বাচন (selection) প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, প্রাক-উৎপাদন অর্থনীতিতে জনসংখ্যা সাধারণভাবে কম ছিল, গোষ্ঠীতে মাতৃ-প্রাধান্য বিরাজিত ছিল এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা শোষণের (exploitation) কোন অস্তিত্ব ছিল না, সামাজিক সংস্থা হিসাবে পরিবারের অস্তিত্ব ছিল, এবং বিবাহ প্রথার অস্তিত্ব থাকলেও যৌন আচরণে বিধি-নিষেধ সম্ভবত কম ছিল।

নব্য প্রস্তর সংস্কৃতিতে খাদ্যোৎপাদন অর্থনীতির সূত্রপাতের ফলে মানুষ খাদ্যের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা কাটিয়ে স্থায়ীভাবে জমির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত হয়ে পড়েছিল। ফলে, অনতিবিলম্বেই জমির অর্থনৈতিক মূল্য উপলব্ধ হয়েছিল, যা ব্যক্তি-সম্পত্তির উদ্ভবের প্রেরণা জুগিয়েছিল। অন্যদিকে, বিভিন্ন ধরনের কাজ-কর্মের প্রয়োজনে পরিবারের গুরুত্ব বেড়েছিল। পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রমের প্রাকৃতিক বণ্টনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বণ্টন পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ়তর করেছিল, এবং সমাজে পিতৃ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মিশ্র-চাষ অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় নানা ধরনের কাজের প্রয়োজনে অধিকতর শ্রমের চাহিদা হয়েছিল; এবং তার ফলে পরিবারে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল।

নতুন অর্থনীতিতে খাদ্যের ব্যাপারে নিশ্চয়তা লাভ, নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস প্রভৃতি কারণে দৈনন্দিন জীবনে মানুষ অনেকটা অবসর লাভ করেছিল। এই অবসর এবং নতুন অর্থ-নীতিতে প্রয়োজনীয় শিল্প-বাণিজ্যের বিকাশ, পার্থিব, অ-পার্থিব বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণার প্রেরণা জুগিয়েছিল। ফলে, একদিকে যেমন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা, আইন-শৃঙ্খলা,

দেব-দেবী, ভূত-প্রেত, ধর্ম, প্রভৃতির প্রসার ঘটে, অপরদিকে তেমনি, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক হয়ে ওঠে। নব্য প্রস্তর যুগের শেষাংশে তামা, টিন এবং উভয়ের সংকর ধাতুরূপে ব্রোঞ্জ-এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এই ব্রোঞ্জ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণে অত্যন্ত উপযুক্ত ধাতুরূপে প্রমাণিত হয়। ইতিমধ্যে চাকা আবিষ্কারের ফলে মৃৎশিল্পে উন্নতি, তুলাকে চাষের আওতাভুক্ত করতে পারায় বয়ন-শিল্পের অগ্রগতি, ঘোড়াকে গৃহপালিত করার ফলে দ্রুত গতি অর্জন এবং ঘোড়া ও চাকার একত্রিত প্রয়োগে শকটের আবির্ভাব সম্ভব হয়। এই সার্বিক কারিগরি ও অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে মানব সমাজ ও সংস্কৃতি দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ নগর-সংস্কৃতিতে উত্তরণের প্রারম্ভিক শর্ত লাভ করে। প্রায় এই সময়েই প্রাচীন লিপির উদ্ভব ও প্রচলন ঘটে, এবং সেইহেতু প্রাগৈতিহাসিক কালের পরিসমাপ্তি ও ঐতিহাসিক কালের সূচনা হয়।

সামগ্রিক বিচারে বলা যায়, আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল নিহিত আছে নব্য প্রস্তর সংস্কৃতির গভীরে। নব্য প্রস্তর সংস্কৃতিতে বিভিন্ন বস্তুগত পরিবর্তনের ফলে মানব সমাজ ও সংস্কৃতির গুণগত পরিবর্তন ঘটে। সেইজন্য নব্য প্রস্তর সংস্কৃতিকে “বৈপ্লবিক” আখ্যায় ভূষিত করা হয়। কৃষিকার্য ও পশুপালন—এই যৌথ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সূত্রপাত না ঘটলে মানুষের জীবনে অপর কোন উদ্ভাবন আদৌ সম্ভবপর ছিল কিনা সন্দেহ। মানুষ হয়ত চিরকাল অন্যান্য পশুর মতই সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতি-দেবীর কৃপা-প্রার্থী হয়ে কেবলমাত্র খাদ্য সংগ্রহেই ব্যাপৃত থাকত।

□ □ □

সমগ্র প্লিস্টোসিন যুগ ধরে অর্থাৎ প্রায় পঁচিশ লক্ষ বছর সময় জুড়ে সংঘটিত হয়েছে মানব বিবর্তনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অংশ ; এবং এই সময়কালের মধ্যেই প্রায়-মানুষ স্তর থেকে আধুনিক মানুষের বিকাশ ঘটেছে। এই পঁচিশ লক্ষ বছরের মধ্যে শেষের মাত্র পাঁচ লক্ষ বছরে গণ 'হোমো'র উৎপত্তি থেকে আধুনিক মানুষে—হোমো স্যাপিয়েন্স্ স্যাপিয়েন্স্-এ রূপান্তর ঘটেছে। আর অস্ট্রালোপিথেকাস স্তর থেকে হোমো ইরেকটাসে বিবর্তনে সময় লেগেছে প্রায় কুড়ি লক্ষ বছর। এসব তথ্য থেকে যেটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় তা হল, বিবর্তন যত মানুষের দিকে এগিয়েছে গতি তত দ্রুত হয়েছে—পূর্ণ মনুষ্যত্বে পৌঁছেছে দ্রুততম বেগে।

বিবর্তনেতিহাসে এজাতীয় ঘটনা নজিরহীন। তাই অন্যান্য প্রাণীর বিবর্তনের সঙ্গে তুলনা করে মানব বিবর্তনকে ঠিক ঠিক অনুধাবন করতে তত্ত্ব-জ্ঞানীদের বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। আর বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বে যেখানে ঘাটতি, ঈশ্বর-বাদের সেখানে নিশ্চিন্ত আশ্রয়। তাই, প্রয়োজন হয়েছিল "ঈশ্বর কর্তৃক আগে আদিম মানবের মাথায় উন্নত-মস্তিষ্ক দিয়ে তারপরে দু-পায়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা অর্জন", অথবা "বিভিন্ন সময়ে গ্রহান্তরের বুদ্ধিমান মানুষ কর্তৃক আদিম মানুষকে বুদ্ধি দান বা আদিম মানুষের মধ্যে গ্রহান্তরের মানুষ দ্বারা দফায় দফায় পরিব্যক্তি ঘটানো এবং প্রশিক্ষণ"—জাতীয় আজগুবি কল্পনার, যাতে আমাদের দৃষ্টিকে অস্বচ্ছ করা যায়, বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানকে আমরা তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারি।

কিন্তু যদি মানব বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার সাংস্কৃতিক বিবর্তনকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা যায় তবে দেখা যায় যে

মানব শাখায় বিবর্তনের শুরু থেকেই প্রাচীন মানব গোষ্ঠী এমন কিছু ক্রিয়াকলাপ করেছে যা তার অভিযোজন পদ্ধতিকে সাহায্য করেছে এবং জীবন সংগ্রামে সার্থকতা দান করেছে।

পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাবের পর থেকে সমগ্র প্রাণী বিবর্তনের ইতিহাসের মূল সূত্র একটিই। তা হল, পরিবর্তিত প্রতিবেশে অভিযোজন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার ক্রিয়া-বিক্রিয়া। এখানে মনে রাখতে হবে, বিবর্তন একটি ক্রমোন্নতি-মূলক প্রক্রিয়া অর্থাৎ প্রগতিধর্মী। প্রাণের প্রত্যেকটি প্রকারের মধ্যেই দুইটি পরস্পর বিরোধী ধর্ম আছে—একটি বংশগতি, অপরটি অভিযোজ্যতা। বংশগতির প্রবণতা প্রাণী-বিশেষের বৈশিষ্ট্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা, আর অভিযোজ্যতার প্রবণতা প্রতিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপনের দিকে। অর্থাৎ, বংশগতি রক্ষণশীল এবং অভিযোজ্যতা প্রগতিশীল শক্তি। যে-প্রাণীর বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু অভিযোজনে প্রতিষ্ঠিত সেক্ষেত্রে বংশগতির সঙ্গে অভিযোজ্যতার দ্বন্দ্ব আপাত ভাবে স্তিমিত কিন্তু নিঃশেষিত নয়। কারণ প্রতিবেশ নিয়ত পরিবর্তনশীল—কোন দুই মুহূর্তের প্রতিবেশ সম্পূর্ণ এক নয়। প্রতিবেশে বড় রকমের কোন পরিবর্তন ঘটলে অভিযোজ্যতা অধিকতর সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তখনই উভয়ের দ্বন্দ্বের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। এই দ্বন্দ্ব প্রাণী মাত্রেরই মৌলিক এবং চিরন্তন দ্বন্দ্ব। বিবর্তনেতিহাসে যেসব প্রাণী অবলুপ্ত হয়েছে, সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক-ভাবেই অনুমান করা যেতে পারে যে বংশগতির কাছে অভিযোজ্যতা সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়েছে, আর তাই এই মৌলিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে। অর্থাৎ, রক্ষণশীল ধারাবাহিকতার কাছে প্রগতিশীল শক্তির পরাভবই প্রাণীবিশেষের অবলুপ্তির কারণ।

এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতেই প্রাণী জগতের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে সরল এবং অনুন্নত প্রাণী থেকে জটিল এবং উন্নত প্রাণীর

আবির্ভাব হয়েছে। অর্থাৎ, প্রাণী জগতের প্রগতি অব্যাহত ধারায় চলেছে। এই প্রগতির মূলবস্তু হল প্রাণীর আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব—বংশগতি ও অভিযোজ্যতার দ্বন্দ্ব। আর, এই দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করা এবং তার মাধ্যমে কোন একটি প্রকারকে উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার মূল ভূমিকা প্রতিবেশের। তাই প্রতিবেশ বিবর্তনের প্রধান কারণ, আর প্রাণীর আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব তার ভিত্তিভূমি।

মানব বিবর্তনের সাক্ষ্য প্রমাণ থেকেও এ সত্য উদ্ঘাটিত হয়। সে আলোচনার আগে জানা প্রয়োজন কোন স্তর থেকে এবং কোন প্রতিবেশীয় প্রেক্ষাপটে মানব বিবর্তন সংঘটিত হয়েছে।

মানুষ স্তন্যপায়ী শ্রেণীর (Class : Mammalia) অন্তর্গত প্রাইমেট বর্গের (Order : Primates) অন্তর্ভুক্ত প্রাণী। সাধারণভাবে স্তন্যপায়ী শ্রেণীর এবং বিশেষভাবে প্রাইমেট বর্গের প্রাণীদের বিবর্তন-হার পূর্ববর্তী অন্যান্য প্রাণীর বিবর্তন-হারের তুলনায় দ্রুতগতি সম্পন্ন। এবং অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মস্তিষ্ক তুলনামূলকভাবে উন্নততর। আবার, প্রাইমেট বর্গের সদস্যদের মস্তিষ্ক অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর তুলনায় উন্নত। প্রাইমেট বর্গের মধ্যে মানুষের ঠিক নীচেই যাদের স্থান সেই এপ-দের মস্তিষ্ক আয়তন ও গুণের বিচারে অন্য সব প্রাইমেটের তুলনায় উন্নত। এই এপ ও মানুষের কোন সাধারণ পূর্বপুরুষ গোষ্ঠী থেকে উভয়ের পৃথকীভবন ঘটেছিল—এ কথা প্রতিষ্ঠিত সত্য। অতএব মানব শাখায় বিবর্তনের শুরুতেই আদি পূর্ব-পুরুষগোষ্ঠীর মস্তিষ্ক অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় উন্নত ছিল এটা সহজেই বোঝা যায়।

প্রাইমেট বর্গের যখন প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল তখন একদিকে স্থলে অন্যান্য স্তন্যপায়ীর সঙ্গে কঠিন প্রতিযোগিতা, অন্যদিকে পৃথিবী-পৃষ্ঠের ব্যাপক অদলবদলের ফলে অরণ্যরাজির আবির্ভাব,

তাদের বৃক্ষে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিল। গোড়ার দিকে তাদের দেহ-কাঠামো বৃক্ষে বসবাসের উপযোগী ছিল না। কিন্তু বৃক্ষে বসবাসের দিকে প্রাকৃতিক নির্বাচন ক্রিয়াশীল হওয়ায় শেষ পর্যন্ত কাঠামোতে অনুকূল পরিবর্তনগুলো সংঘটিত হয়েছিল ; এবং প্রাক-বানর, বানর, এপ প্রভৃতি নানা প্রকরণের উদ্ভব হয়েছিল। প্রতিবেশের ব্যাপক পরিবর্তনের ফলেই আবার পরবর্তীকালে এই বৃক্ষে-অভিযোজিত প্রাইমেটদের কোন কোন সদস্য মাটির জীবন গ্রহণে বাধ্য হয়। এদেরই কোন শাখা থেকে মানব শাখার উদ্ভব হয়েছিল বলে বোঝা যায়।

মায়োসিন যুগের শেষ ভাগে মানব পরিবারের প্রথম সদস্যের (Ramapithecus) যে প্রমাণ পাওয়া যায় তার দাঁতের কাঠামো বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে তারা চলা-ফেরা থেকে সামনের অঙ্গকে মুক্ত করতে পেরেছিল।

সামনের অঙ্গ (হাত দুটো)-কে মুক্ত করে পিছনের অঙ্গ (পা দুটো)-এর সাহায্যে চলা-ফেরার জন্য যে গাঠনিক বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন তা-ই মানব পরিবারের পরবর্তী সদস্যদের মানুষে রূপান্তরের পূর্বশর্ত হিসাবে কাজ করেছিল। ঠিক কিভাবে এই গাঠনিক বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হয়েছিল তা স্পষ্টভাবে জানতে না পারলেও একথা যুক্তিসঙ্গত ভাবেই অনুমান করা যায় যে, উন্নত প্রাইমেট বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরিবর্তিত প্রতিবেশে অভিযোজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই তার উৎপত্তি হয়েছিল। অর্থাৎ জীবন সংগ্রামে টিঁকে থাকতে হলে এই গাঠনিক পরিবর্তন ছাড়া অন্য কোন রাস্তা ছিল না।

হাতকে মুক্ত করতে পারায় নানা ধরনের এমন সব কাজের ক্ষমতা সেই আদি মানব গোষ্ঠী অর্জন করেছিল যেগুলোর সাহায্যে সে তার মূলত দুর্বল দেহের ঘাটতি পূরণ করে জীবন সংগ্রামে টিকে থাকতে পেরেছিল। অভিযোজন প্রক্রিয়ায় সেই আদি মানব গোষ্ঠী এমন একটি উপায় উদ্ভাবন করতে সমর্থ হয়েছিল যা

দেহের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থেকেও সমস্ত প্রতিবেশে অভিযোজনের ক্ষমতা জুগিয়েছিল। জীবন ধারণের প্রয়োজনে তারা বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুকে সাফল্যের সঙ্গে এবং প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবহারে সমর্থ হয়েছিল। এবং অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরবর্তীকালে প্রাকৃতিক বস্তুকে কেটে-ছেঁটে প্রয়োজন মাফিক হাতিয়ার (tool) নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিল। এখানেই সংস্কৃতি (culture)-র সূত্রপাত এবং এই সাংস্কৃতিক ক্রিয়া-কলাপই মানুষের পূর্বপুরুষ গোষ্ঠীকে জীবন সংগ্রামে টিঁকে থাকতে সাহায্য করেছিল।

অভিযোজনের এই অভিনব পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নির্বাচন-চাপ দেহের সেই সব অঙ্গের ওপর অধিকতর ক্রিয়াশীল হয়েছিল যেগুলোর সঙ্গে সাংস্কৃতিক ক্রিয়া-কলাপের সম্পর্ক আছে, যেমন, দুপায়ে দাঁড়ানো ও চলা-ফেরা এবং অনুষঙ্গরূপে মস্তিষ্কের পরিমাণগত ও গুণগত উন্নতি। পঞ্চম পরিচ্ছেদে আমরা প্লিষ্টোসিন যুগের শুরু থেকে সাংস্কৃতিক ও আনুষঙ্গিক দৈহিক ক্রমবিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করেছি। বাঁচার লড়াইয়ের পার্শ্ব-ফল হিসাবে মানব গোষ্ঠীর জীবন যাত্রায় দুটো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ঘটেছিল যা তাদের দ্রুত মানবীকরণে সহায়ক হয়েছিল। প্রথমত, মাংসাহার। প্রাইমেট গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে প্রাচীন মানব গোষ্ঠীও প্রধানত নিরামিষাশী ছিল। কিন্তু, মূলত আত্মরক্ষার প্রয়োজনে জন্তুর পিছনে তাড়া করা ও হত্যায় কৃতকার্য হওয়া এবং খাদ্যাভাব, এই দুয়ের মিলিত ফলেই সম্ভবত তারা মাংসাহার শুরু করে। কাকতালীয় যোগাযোগের ফলে মাংস খাওয়া শুরু হলেও অনতিবিলম্বেই মাংসাহারের গুরুত্ব ও উপকারিতা উপলব্ধ হয়, এবং তারা ক্রমে মাংসাহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। খাদ্য হিসাবে মাংসকে গ্রহণ করার ফলে যে মস্তিষ্ক গোড়া থেকেই উন্নত ছিল তা উন্নততর হওয়া সহজতর হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, গোষ্ঠী জীবন।

প্রথমদিকে আত্মরক্ষার তাগিদে এবং পরে শিকারের প্রয়োজনে গোষ্ঠী জীবন অবশ্যম্ভাবী হয়েছিল। ক্রম বিবর্তনের ধারায় এই গোষ্ঠী জীবন আরও সুসংহত হয়েছিল। একদিকে যেমন আমিষ খাদ্য গ্রহণ মস্তিষ্কের পরিমাণগত ও গুণগত বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল, অপরদিকে গোষ্ঠীবদ্ধতা সহায়তা করেছিল ব্যক্তি-সামর্থ্যের সংহতি সাধন এবং অভিজ্ঞতার গোষ্ঠী-ভিত্তিক সঞ্চয়নে ও সেই অনুসারে উত্তরসূরীদের শিক্ষিত করে তুলতে।

এইভাবে সাংস্কৃতিক ক্রিয়া-কলাপ ও দৈহিক পরিবর্তন পরস্পরের কারণ ও ফল হিসাবে কাজ করার ফলেই সম্ভবত মানব বিবর্তনের হার দ্রুতগতি সম্পন্ন হয়েছিল।

সুতরাং, প্রধানত প্রাকৃতিক প্রতিবেশের প্রভাবের ফলেই সম্ভবত মানবশাখার উদ্ভব ঘটেছিল, কিন্তু মানবীকরণ সম্পন্ন হয়েছিল হাতিয়ার-ভিত্তিক অভিযোজনে—যা অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও শিক্ষার মাধ্যমে বংশ-পরম্পরায় পরিবাহিত হয়ে একটা সাংস্কৃতিক কাঠামো তৈরি করেছিল। খাদ্য-সংগ্রহ ও আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সংস্কৃতি-বস্তু তৈরি, সফল প্রয়োগ ও বংশানুক্রমে পরিবহনের জন্য গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন অবশ্যম্ভাবী হয়েছিল। মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যেও অনেকের গোষ্ঠীবদ্ধতা, এমনকি সমাজ জীবনও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সংস্কৃতি ব্যাপারটা একান্তভাবেই মানবিক; এবং সমাজ ও সংস্কৃতির যে যৌথ অস্তিত্ব মানুষের আছে তা অন্য কোন প্রাণীর নেই, সেখানেই মানুষ পশুত্বকে অতিক্রম করেছে।

জীবন সংগ্রামের মাধ্যমে যে প্রতিবেশকে মানুষ জানতে ও বুঝতে শুরু করেছিল, প্রকৃতির নিয়ম-কানুন জানতে সক্ষম হওয়ায় আজ তার অনেকটাই মানুষের আয়ত্তাধীন। শুধু তা-ই নয়, সাংস্কৃতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ স্ব-সৃষ্ট কৃত্রিম প্রতিবেশে ক্রমশ আবদ্ধ হয়ে গেছে এবং প্রকৃতি থেকে সরে এসেছে। ফলে, প্রাকৃতিক প্রতিবেশ আর মানুষের ওপর উল্লেখযোগ্যভাবে

ক্রিয়াশীল নেই। তাই, মানব বিবর্তনের বর্তমান পর্যায় প্রধানত, সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিবেশানুগ। বর্তমান সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে 'প্রতিবেশ', 'বংশগতি', 'অভিযোজন' কথাগুলো তাই নতুন অর্থে বুঝতে হবে। প্রতিবেশ অর্থে মূলত সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ ; বংশগতি এখন আর শুধুমাত্র দৈহিক বৈশিষ্ট্যের পারম্পর্য নয়, সামাজিক রীতি-নীতি, আদব-কায়দা, ইত্যাদিরও পরিবহন ; অভিযোজ্যতা-ও তাই সমাজ-সংস্কৃতি সাপেক্ষ।

অগেই উল্লেখ করা হয়েছে, প্রগতির মূল নিহিত রয়েছে বংশগতি ও অভিযোজ্যতার চিরন্তন দ্বন্দ্বে, যে-দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয় প্রতিবেশের পরিবর্তনে। আধুনিক মানুষ যেহেতু আর প্রাকৃতিক প্রতিবেশের নিয়ন্ত্রণাধীন নেই, অভিযোজ্যতাও তাই আর স্বয়ংক্রিয় নেই। অর্থাৎ আজকের মানুষ স্বেচ্ছায় তার অভিযোজনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এবং অভিযোজ্যতার মূল সম্পর্ক যে প্রতিবেশের সঙ্গে—বর্তমান সভ্যতায় সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ—সেই প্রতিবেশেরও অনেকটাই মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই মানুষ আজ নিজেই নিজের প্রগতির নিয়ন্ত্রক। আর, প্রগতির পথ-নির্দেশও মানুষকেই করতে হবে তার ব্যক্তি চেতনা, সমাজ চেতনা ও বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে।

